

রামচরিত্র

প্রফুল্ল রায়

RAMCHARITRA

A BENGALI NOVEL

BY

PRAFULLA ROY

রামচরিত্র

প্রফুল্ল রায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯,

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
যামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

রামচরিত্র



লখিনপুরা টাউনের শেষ মাথায় বিশাল রামসীতা মন্দির। আগাগোড়া মন্দিরটা শ্বেতপাথরে বাঁধানো। মাটি থেকে চওড়া চওড়া সিঁড়ি ভেঙে পনের ফুট উঁচুতে উঠলে অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলামেলা চবুতর। অবশ্য কারুকাজ-করা মোটা মোটা থামের মাথায় এখানে ছাদ রয়েছে। তৌহার বা পরবের দিনে এই ছাদের তলায় ভজনের আসর বসে। কখনও সখনও হিন্দু মিশনের সন্ন্যাসীরা এসে গীতা বা উপনিষদ ব্যাখ্যা ক'রে যান। তবে সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন বুড়ো ফাগুয়ান ঝা নিয়ম ক'রে তুলসীদাসের রামচরিতমানস পাঠ করে। চারদিকে চারটে থামে লাউড স্পিকারের চোঙা লাগানো। কেননা এই মন্দিরে অচ্ছুৎদের প্রবেশ নিষেধ। অথচ ভজন এবং শাস্ত্রপাঠ থেকে তাদের বঞ্চিত করা ঘোর অধর্ম, তাই লাউড স্পিকারের ব্যবস্থা। লখিনপুরা এবং আশেপাশের অচ্ছুৎরা মন্দিরের বাইরে ফাঁকা মাঠে বসে ভজন আর শাস্ত্রের মহান ব্যাখ্যা শুনে যায়। মন্দিরের যে জায়গাটায় রামচরিত বা গীতাপাঠের আসর বসে তার ঠিক পেছনেই বিরাট কোলাপসিবল গেট, গেটের পর তিন ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা; তার পাল্লায় ফুললতা পাতা এবং দেবদেবীর নকশা। দরজা খুললেই মস্ত চাঁদির সিংহাসনে রুপোর ছত্রির নিচে রামসীতার সুদৃশ্য মূরত বা মূর্তি। দুই বিগ্রহের গায়ে পাকা সোনা এবং হীরা-মোতি-চুনি-পান্নার

দামী দামী অলঙ্কার। তা ছাড়া প্রতিদিন টাটকা ফুলের গয়নাও পরানো হয়।

রামসীতা মন্দিরের চূড়া এত উঁচু যে মাইল দেড়েক তফাত থেকেও চোখে পড়ে। যতদূর ওটা দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত হিন্দুধর্মের অপার মহিমা যেন ছড়িয়ে থাকে।

কার্তিক মাস শেষ হয়ে এল। ক'দিন আগে দেয়ালী গেছে। দিন কয়েক পর ছট পরব। উত্তর বিহারের এই অঞ্চলে এর মধ্যেই বাতাসে হিমের দানা মিশতে শুরু করেছে। এখন বাতাসে গায়ে কাঁটা দেয়। আজকাল সকালে এবং সন্ধ্যায় ঘন হয়ে কুয়াশা নামে। জাঁকিয়ে শীত পড়তে এখনও কিছু বাকি। তবু এরই ভেতর দিগন্ত পেরিয়ে পরদেশী শুগার ঝাঁক আসতে শুরু করেছে। গাছপালার গায়ে সতেজ চিকন ভাব আর নেই। সব কিছুর ওপর ধূসর ছোপ পড়তে শুরু করেছে আবছাভাবে।

সবে সকাল হয়েছে। অনেক দূরে আকাশ যেখানে শিরদাঁড়া নুইয়ে দিগন্তে নেমেছে ঠিক সেই জায়গায় সোনার কটোরার মতো সূর্যটা স্থির হয়ে আছে। এখনও বেশ কুয়াশা চারদিকে। কিন্তু কতক্ষণ আর। একটু পরেই কার্তিকের মায়াবী রোদের ঢল নামবে মাঠঘাট শস্যক্ষেত্র ভাসিয়ে।

ঠিক এই সময় রামচরিত চৌবে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে মন্দিরে উঠছিলেন। রোজ সকালে সূর্য ওঠার মুহূর্তে তিনি এখানে এসে রামসীতার মূরতকে প্রণাম ক'রে যান।

তাঁর আসল নাম রামচরিত্র। কিন্তু লোকের মুখে মুখে সেটা রামচরিত হয়ে গেছে। তাঁরা চৌবে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ।

রামচরিতের বয়স চুয়ান্ন পঞ্চান্ন। গায়ের রং টকটকে। শরীরে কিছু মেদ জমলেও তাঁকে সুপুরুষ বলা যায়। চেহারা টান টান। লম্বাটে মুখ। কাঁচাপাকা চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা; পেছন দিকে

মোটা টিকি। এই বয়সেও তাঁর ত্বকে আশ্চর্য মসৃণতা ; মনে হয় ভেতর থেকে অলৌকিক দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। রামচরিত যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মতো শুদ্ধ জীবনযাপন করেন তাঁর চেহারায় সেই ছাপ রয়েছে। অনেকেই জানে না, বিবাহিত হলেও তিনি প্রায় ব্রহ্মচারীই।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সকালবেলাতেই স্নান হয়ে গেছে রামচরিতের। পরনে শুধুমাত্র একটি সাদা পাড়হীন থান। শরীরের ওপরের অংশে কিছু নেই। কপালে মোটা ক'রে শ্বেত চন্দনের তিনটে রেখা, কানের লতিতেও চন্দনের ফোঁটা। খালি পা। এইভাবেই শীতগ্রীষ্ম বারোমাস তিনি মন্দিরে প্রণাম করতে আসেন।

এই প্রণামের একটি ধারাবাহিক পবিত্র ইতিহাস আছে।

লখিনপুরায় রামসীতা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ষাট বছর আগে রামচরিতের ঠাকুরদা রামসিংহাসন চৌবে। তখন এ অঞ্চলে হিন্দুধর্মের পক্ষে আপৎকাল চলছে। নিচের স্তরের অচ্ছুৎ হিন্দুরা গোমাংস খেয়ে রাতারাতি ধর্ম বদল ক'রে যাচ্ছিল। এমন একটা ধস নেমেছিল চারদিকে যাতে শিক্ষিত সচেতন উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ের যথেষ্ট কারণও ছিল। এভাবে ধর্মান্তর ঘটলে লখিনপুরার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের সংখ্যা ভয়ানক কমে যাবে। তাতে এতদিনের সামাজিক ভারসাম্য ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই এটা ঠেকানো দরকার। যেভাবেই হোক, হিন্দু মেজরিটি বজায় রাখতেই হবে। সুপ্রাচীন কালের এই সনাতন ধর্মের সুরক্ষার জন্য এমন কিছু করা দরকার যা চিরস্থায়ী এবং মজবুত। এ কাজে সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন রামচরিতের ঠাকুরদা রামসিংহাসন চৌবে।

রামসিংহাসন সকল অর্থেই ছিলেন চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ। গভীর নিষ্ঠায় তিনি চারটি বেদের চর্চা করেছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রায় ছিল চরম শুদ্ধাচার। এ যেমন একটা দিক, তেমনি আরো একটা বড় দিকও রয়েছে। রামসিংহাসন এ অঞ্চলের একজন বড় জমি-মালিক। প্রায়

হাজার বিঘা জমি ছিল তাঁর। এই জমিজমার সামান্যই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বেশির ভাগটাই নানা কূটকৌশলে গরীব আনপড় অচ্ছুৎদের সর্বস্বান্ত ক'রে, তাদের পথে বসিয়ে দখল করেছিলেন। প্রচুর কিষাণ খাটত তাঁর ক্ষেতিতে ; তাদের অনেকেই বান্ধুয়া মজদুর বা বেগার-খাটা ভূমিদাস।

তবু লখিনপুরা টাউনের বিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে সব মানুষই তাঁকে মানত, যথেষ্ট খাতিরদারি ক'রে চলত এবং প্রচণ্ড ভয়ও পেত।

রামসিংহাসন বুঝতে পারছিলেন, এমন কিছু করা দরকার যাতে হিন্দুধর্মের স্তিমিত ধমনীতে নতুন ক'রে বেগ এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। প্রচুর ভাবনাচিন্তা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে যাগযজ্ঞ ক'রে রামসীতা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। এই উপলক্ষে, হিন্দুধর্মের সেই দুঃসময়ে, তাবত হিন্দুকে তিনি জড়ো করেছিলেন।

কিন্তু এত বড় একটা মহৎ কাজে বিস্তর টাকা দরকার। সেই অর্থ তাঁর ছিল। তবে ঘরের পয়সা খরচ ক'রে মহান হিন্দুধর্মের উপকার করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। রামসিংহাসন যজ্ঞ এবং মন্দিরের জন্য চাঁদা তুলতে শুরু করেছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়াথ ক্ষত্রিয় রাজপুত দোসাদ কোয়েরি তাতমা ধাঙড়—হিন্দু হলেই হল। সবার কাছেই তিনি হাত পেতেছিলেন। পয়সার জাতপাত নেই।

কিন্তু এই অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ গরীবের চাইতেও গরীব। তারা কী আর দিতে পারে! রামসিংহাসন ঠিক করেছিলেন, এই বিরাট ব্যাপারে আরো বেশি মানুষকে, বিশেষ ক'রে বড় বড় পয়সাওলা লোক এবং দেশনেতাদের জড়িয়ে ফেলতে হবে। লখিনপুরার দু'জন কায়াথ এবং একজন রাজপুত ক্ষত্রিয় পাটনা এবং কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা ক'রে, কলকারখানা বসিয়ে প্রচুর পয়সা করেছিল। রামসিংহাসন সোজা ঐ দুই শহরে চলে গিয়েছিলেন এবং পরিচিত ব্যবসাদারদের কাছে তো বটেই, তাঁদের মারফত অন্যান্য

ব্যবসাদার এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছেও ডোনেসনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

রামসিংহাসন কথা বলতেন চমৎকার। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল আশ্চর্য যাদু। কলকাতা এবং পাটনায় অনেকগুলো সভা ক'রে বিপন্ন হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তাতে দুই শহরে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁর পাটনা এবং কলকাতা ভ্রমণ ব্যর্থ হয় নি। দু জায়গা থেকেই হুড়হুড় ক'রে ধর্ম রক্ষার জন্য টাকা আসতে শুরু করেছিল। মাত্র একবারের ডোনেসন নয়, দূরদর্শী রামসিংহাসন ভবিষ্যতের জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থাও ক'রে এসেছিলেন। ব্যবসাদাররা পুরুষানুক্রমে মাসিক চাঁদা পাঠিয়ে আসছে। ষাট বছর ধরে এই নিয়ম চালু আছে। সেই টাকাতেই মন্দিরের খরচ চলে এবং হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্য নানা পরিকল্পনাও নেওয়া হয়।

শোনা যায়, রামসিংহাসন যে টাকা যোগাড় করেছিলেন তা থেকে নিজের জন্য সিকি পয়সাও সরান নি। এখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

চারদিক থেকে চাঁদা এবং ডোনেসন আসার পর পনের দিন ধরে এখানে হোমযজ্ঞ হয়েছিল। তারপর আরম্ভ হয়েছিল মন্দির তৈরির কাজ। এই কারণে আগ্রা থেকে রাজমিস্ত্রি এবং জয়পুর থেকে শ্বেতপাথর আনানো হয়েছিল।

মন্দির তৈরির সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কাজ করেছিলেন রামসিংহাসন। এ অঞ্চলে গরমের সময় জলের ভীষণ কষ্ট। চারদিকের বিল-ঝিল-নহর শুকিয়ে যায়। মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত্র রোদের অসহ্য তাপে ফেটে যেতে থাকে। রামসিংহাসন লখিনপুরা এবং চারপাশের গ্রামগুলোতে পঞ্চাশ ষাটটা বড় বড় কুয়ো কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য বংশানুক্রমে চৌবেদের কাছে এদিকের মানুষ কেনা গোলাম হয়ে আছে।

নিজে রোজ দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটিয়ে আড়াই বছর ধরে এই বিরাট রামসীতা মন্দির করেছিলেন রামসিংহাসন। এত বড় আকারে

এটা করার কারণ একটাই, দিকে দিকে হিন্দুধর্মের অপার মহিমা প্রচার।

ষাট বছর আগে যারা ছিল বালক বা যুবক তাদের বেশির ভাগই মরে ফৌত হয়ে গেছে। যে দু-পাঁচজন এখনও টিকে আছে তারা বলে, মন্দির উদ্বোধনের দিন রাজসূয় যজ্ঞের মতো একটা কাণ্ড হয়েছিল। কয়েকজন বিখ্যাত দেশনেতা এবং শৃঙ্গেরি মঠের সাধু মহারাজরা এসেছিলেন লখিনপুরায়। তা ছাড়া মন্দির দেখতে গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি ক'রে কিংবা পায়ে হেঁটে হাজার মানুষ এসেছিল দূরদূরান্ত থেকে।

তবে বিপুল ঘটা ক'রে এই যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল, হিন্দুধর্মের সুরক্ষা এবং হিন্দুজাতির একাত্মতার জন্য এত যাগযজ্ঞ হল, তাতে ধর্মান্তরটা ঠেকানো গেলেও জাতপাতের সওয়ালটা একই রকম থেকে গেছে। জল-অচল অচ্ছুৎরা মন্দিরে ঢুকতে পায় না, বাইরের রাস্তায় মাথা ঠেকিয়ে মহান হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকার গৌরবে কৃতার্থ হয়ে যায়।

মন্দির উদ্বোধনের দিন থেকেই রামসিংহাসন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্নান সেরে রামসীতার মূরতকে প্রণাম করবার যে অভ্যাসটি চালু করেছিলেন সেটাই পরে পারিবারিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। রামসিংহাসনের পর তাঁর ছেলে রামশরণ এবং তারও পর তস্য পুত্র রামচরিত ষাট বছর ধরে এই সকালবেলায় এখানে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। অসুখ বিসুখ হলে কিংবা দু-চারদিনের জন্য বাইরে কোথাও গেলে আলাদা কথা। নতুবা তিন পুরুষ ধরে এই কৌলিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

মোট একত্রিশটি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে আসতেই রামচরিতের চোখে পড়ল, মন্দিরের পুরোহিত বুড়ো বাগীশ্বর মিশ্র কোলাপসিবল গেট এবং কাঠের বিশাল দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাগীশ্বর এই মন্দিরেই থাকে এবং প্রতিদিন ভোরবেলা এভাবেই রামচরিতের জন্য অপেক্ষা করে।

শুধু বাগীশ্বরই না, তার আগে যারাই এখানে পুরোহিত হয়ে এসেছে তারাও রামচরিত রামশরণ বা রামসিংহাসনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। এই মন্দির যদিও জনগণের টাকায় তৈরি তবু চৌবেরা তিন পুরুষ ধরে এটাকে নিজস্ব পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে আসছে।

লখিনপুরা টাউনের এদিকটা বেশ নির্জন। কার্তিকের এই সকালে ক্বচিৎ দু-একটা লোক চোখে পড়ছে। তবে গাই-বকরি চরানিরা ছাগল এবং গরুর পাল নিয়ে পুবদিকের ফাঁকা মাঠগুলোতে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। চারদিকে পরাস সীমার এবং পীপর গাছের ছড়াছড়ি। গাছগুলোর মাথায় অজস্র পাখি উড়ে উড়ে নানারকম আওয়াজ ক'রে একটানা ডেকে চলেছে।

রামচরিত কোনোদিকে তাকালেন না; সোজা মন্দিরে ঢুকে রামসীতার মূরতের সামনে জোড়হাতে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রইলেন। এই সময়টা তাঁকে আশ্চর্য পবিত্র এবং ধ্যানস্থ মনে হয়।

দিনের প্রথম কাজ অর্থাৎ এই প্রণামটি সেরে বেরিয়ে এলেন রামচরিত। অন্য দিন মন্দিরের বাইরে এসে বাগীশ্বরের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প টল্প করেন। কিন্তু আজ তাঁর প্রচণ্ড তাড়া। কিছুক্ষণ পরেই লখিনপুরা এবং চারপাশের গাঁ-গঞ্জ এবং ছোট খাট টৌনগুলো থেকে উচ্চবর্ণের 'সরগনা আদমী' অর্থাৎ মান্যগণ্য লোকেরা তাঁর সঙ্গে বিশেষ জরুরি কাজে দেখা করতে আসবেন। তার আগেই সকালবেলার অন্যান্য দরকারী কাজগুলো চুকিয়ে ফেলতে হবে।

রামচরিত দাঁড়ালেন না। বাগীশ্বরের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাটনা কলকাত্তা ধানবাদ দিল্লী থেকে টাকা-পয়সা আসছে?'

এখন নভেম্বরের শুরু। প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম দু সপ্তাহের ভেতর নানা জায়গা থেকে মন্দিরের ঠিকানায় ডোনেসন আসে। চেক এবং মনি অর্ডারে দানের টাকা পাঠায় ব্যবসাদার এবং

ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা। মন্দিরের পুরোহিত পোস্ট অফিসের পীওনদের কাছ থেকে এসব বুঝে নেয়। সমস্ত·ডোনেসন আসার পর রামচরিত হিসেব নিয়ে বসেন।

বাগীশ্বর রামচরিতের পেছন পেছন লম্বা পা ফেলে আসছিল। সে বলে, 'হাঁ, আসছে।'

'সব ঠিক ক'রে গুছিয়ে রাখবেন, কিছু খোয়া না যায়। দো-চার রোজ পর এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বসব। পাবলিকের টাকা, একটা পয়সা এদিক ওদিক হলে বদনাম। হোঁশিয়ারিসে কাম করনা—'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

ছাদওলা প্রকাণ্ড চাতালটার শেষ মাথায় এসে থেমে যায় বাগীশ্বর। আর একত্রিশটা সি ড়ি ভেঙে ফের নিচে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন রামচরিত।

মন্দিরের সামনে দিয়ে যে পাকা সড়কটা বরাবর লখিনপুরা টাউনের মাঝখানে চলে গেছে সেটা ধরে রামসীতা মন্দিরের দিকে আসছে চৌপটলাল। তার পেছনে তিনটে আওরত।

চৌপটলালকে চেনেন রামচরিত। লোকটা বিষ্ঠার পোকা। খানিকটা দূরে থাকার জন্য তার সঙ্গিনীদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে ওরা কী ধরনের জীব, কোথাকার বাসিন্দা, আন্দাজ ক'রে নেওয়া যায়। দুনিয়ার মাত্র একজাতের ওঁচা মেয়েমানুষের সঙ্গেই তার কাজ-কারবার, চলাফেরা, ওঠাবসা।

লখিনপুরার যেদিকে রামসীতা মন্দির, তার ঠিক উল্টোদিকে টাউনের আরেক মাথায় এখানকার সব চাইতে নোংরা, সব চাইতে ঘৃণ্য এলাকা। শুদ্ধ ভাষায় জায়গাটা হল নিষিদ্ধ পল্লী। চালু কথায় রেণ্ডিকা ঘর বা রেণ্ডিটুলি। চৌপটলালরা ওখানেই থাকে। শ চারেক বেশ্যার বিরাট কলোনি ওটা। লখিনপুরার মতো ছোট মাপের টাউনে এত বেশ্যার মহাসম্মেলন কীভাবে ঘটল তা জানতে হলে রামচরিতের

ঠাকুরদা রামসিংহাসনের জীবনচরিত ঘাঁটাঘাঁটি দরকার। কিন্তু সে সব এখন নয়।

এক প্রান্তে পবিত্র রামসীতা মন্দির, আরেক প্রান্তে রেণ্ডিটুলি, দুটোই রামসিংহাসনের অপার কীর্তি। তবে বেশ্যাপাড়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা লখিনপুরার কেউ জানে না। জানলেও মুখ ফুটে বলার সাহস নেই। মোট কথা, পাপ এবং পুণ্য দিয়ে এই শহরে একটা নিগূঢ় ব্যালান্সের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন রামসিংহাসন।

চৌপটলালরা আরো কাছে এসে গেছে। এই লোকটা রেণ্ডিটুলির দালাল—বেশ্যাদের আড়কাঠি। ঐ পাড়াতেই তার জন্ম, ওখানেই বড় হয়েছে, আমৃত্যু ওখানেই কেটে যাবে তার।

রামচরিত যে ধরনের শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ, শ্রদ্ধা ভক্তি ভয় মিলিয়ে 'লখিনপুরার মানুষের কাছে তাঁর যে বিরাট ইমেজ, সোসাইটির সুউচ্চ চূড়ায় রামজী কি কিষুণজীর মূরতের মতো তিনি যেভাবে প্রতিষ্ঠিত তাতে তাঁর পক্ষে একটা নোংরা কুৎসিত রেণ্ডির দালাল সম্পর্কে কোনো কিছুই জানার কথা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা যত ঘৃণ্যই হোক, রামচরিতকে জানতে হয়েছে। কারণ ফী মাসের মাঝামাঝি একদিন গভীর রাতে লখিনপুরা টাউন গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেলে নিঃশব্দে কৃমির মতো বুকে হেঁটে রামচরিতের সঙ্গে দেখা ক'রে যায় চৌপটলাল। কিন্তু সেসব কথাও এখন নয়।

লোকটার বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ। দেখে মনে হয় ষাট। চোয়াড়ে মুখ। চোখ ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢোকানো, তার তলায় চিরস্থায়ী কালির পোঁচ। ভাঙা গালে খাপচা খাপচা দাড়ি, বাঁকা শিরদাঁড়া, থ্যাবড়া থুতনি। কণ্ঠার হাড় গজাল হয়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছে। খসখসে চামড়ায় শুকনো ঘায়ের দাগ। বোঝা যায়, গুপ্ত রোগ গায়ে ফুটে বেরিয়েছিল। সব মিলিয়ে পোকায়-কাটা চেহারা।

চৌপটলালের পরনে সরু চোঙার মতো ময়লা চুস্ত আর ডগডগে লাল কামিজ। তার ওপর কাচ এবং পুঁতি বসানো সস্তা ভেলভেটের

খাটো বগলকাটা কোট। পায়ে শুঁড়তোলা চটকদার নাগরা, মাথায় নকশাদার বেনারসী টুপি।

কাছাকাছি আসতে চৌপটলালের সঙ্গিনীদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাদের দু'জন মাঝবয়সী। ভাঙাচোরা কর্কশ চেহারায়, নোংরা চোখে, রুক্ষ মুখে রেণ্ডিটুলির স্থায়ী ছাপ মারা আছে। তাদের জীবনযাপন কী ধরনের, চেহারা থেকেই টের পাওয়া যায়।

এই সকালবেলায় উজ্জ্বল সূর্যালোকে লখিনপুরা টাউনের বাড়ি ঘর, দূরের মাঠ ঘাট শস্যক্ষেত্র যখন ভেসে যাচ্ছে, ঝির ঝির ক'রে বইছে কার্তিকের নির্মল বাতাস, রামসীতা মন্দিরের চারপাশ যখন অসীম পবিত্রতায় আপার্থিব হয়ে আছে, যখন সমস্ত কিছুই স্তব্ধ মালিন্যহীন মহিমান্বিত, সেই সময় চৌপটলাল এবং মেয়েমানুষ তিনটেকে দেখে চোখ কুঁচকে গেল রামচরিতের ; পেটের ভেতরটা গুলিয়ে মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হল, উল্‌টি আসবে অর্থাৎ বমি ক'রে ফেলবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর চোখ পড়ল তৃতীয় আওরতটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থমকাল এবং তার পরেই সেটার উত্থানপতন দশগুণ বেড়ে গেল যেন। ধমনীর ভেতর দিয়ে ফেনায়িত রক্তস্রোত প্রবল বেগে ছুটতে লাগল।

অন্য আওরত দুটোকে রাস্তাঘাটে হয়ত কখনও দেখে থাকবেন রামরচিত। সামান্য মুখচেনা মনে হল। কিন্তু তিন নম্বর মেয়েমানুষটিকে আগে কখনও দেখেন নি। অচেনা এই আওরতটার দিকে তাকানো মাত্র নেশা ধরে যায়। তার বয়স বিশ বাইশ। বেশ্যাপাড়ার ছাপ এখনও চোখে মুখে পড়ে নি। বড় বড় টানা চোখে একই সঙ্গে ছুরির ধার এবং ঢুলু ঢুলু মাদকতা। ছোট্ট কপাল, লালচে চুল শিথিল একটা খোঁপায় আটকে চাঁদির কাঁটা বসিয়ে দিয়েছে। কাঁটাগুলোর গড়ন সাপের মতো। দুই ভুরুর মাঝখানে উল্কি—সেটাও একটা সাপ।

মেয়েমানুষটার রং মাজা কাঁসার মতো ; এত ঝকঝকে যে চোখ

ঠিকরে যায়। চামড়া টান টান, মসৃণ, পিছল। ভরাট গাল, পাতলা ফুরফুরে নাকের পাটায় রক্তবিন্দুর মতো ঝুটো লাল পাথরের নাকফুল। গলায় চাঁদির হার, কানে করণফুল, হাতে চাঁদির কাঙনা, দুই পায়ের মাঝখানের আঙুলে চাঁদিরই চুটকি। নিটোল লম্বাটে গলা। ঠোঁট কমলার কোয়ার মতো পুরু এবং ভেজা ভেজা।

দুই বুক যেন জোড়া পাহাড়। কাঁচুলি ধরনের খাটো জামা এবং খেলো জ্যালজেলে শাড়ি ছাড়া পরনে কিছু নেই। তাতেই বোঝা যায়, স্তনদুটো সুগঠিত, দৃঢ়, মাংসল। পাতলা কোমর, তাতে তীব্র লচক। তার পেছন দিকটা তানপুরার মতো—ভারী এবং বিশাল।

শাড়ির বাঁধন তলপেটের কাছাকাছি বলে বুকের তলা থেকে কোমর পর্যন্ত অংশটা পাতলা শাড়ির ভেতর দিয়ে দেখা যায়। সুগভীর নাভি তার, পাতলা মেদশূন্য পেট। হাতদুটো কাঁধ থেকে সটান নেমে এসেছে।

মেয়েটার চামড়ার তলা থেকে তীব্র ঝাঁঝালো হল্কার মতো কী যেন অনবরত উঠে আসতে থাকে। বেশিক্ষণ তার দিকে তাকালে মাথা ঝিম ঝিম করে, নিঃশ্বাস লু-বাতাসের মতো গরম হয়ে ওঠে।

মেয়েমানুষের এমন মারাত্মক দেহ আগে আর কখনও দেখেন নি রামচরিত। তাঁর রক্তের ভেতর দিয়ে নিজের অজান্তেই অদ্ভুত ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে যেতে থাকে। দ্রুত অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেন তিনি।

এদিকে চৌপটলালরা কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চোখাচোখি হতেই 'নমস্তে হুজৌর' বলে চৌপটলাল রাস্তার ধুলোতেই লম্বা হয়ে শুয়ে প্রণাম জানায়। অবশ্য রামচরিতের পা ছোঁয় না। একে সে বেশ্যার দালাল, তার ওপর বেজন্মা। অচ্ছুতের চাইতেও অচ্ছুৎ। রামচরিতের পা ছোঁয়ার অধিকার বা দুঃসাহস কোনোটাই নেই তার।

হঠাৎ অসহ্য রাগে মাথার ভেতর শিরা ছিঁড়ে যায় রামচরিতের। এই শুয়োরের বাচ্চাটা কোনোদিন এদিকে আসে না ; আজ এসে এই

সুন্দর সকালটাকে একেবারে নোংরা ক'রে দিয়েছে। শুধু তাই না, ওঁচা আওরতগুলোকে এনে পবিত্র আকাশ বাতাস এবং সূর্যালোককে পাপের জীবাণুতে ভরে ফেলেছে।

গভীর রাতে লখিনপুরা ঘুমিয়ে পড়লে চৌপটলাল যে তাঁর কাছে আসে তার কোনো সাক্ষী থাকে না। কিন্তু দিনের বেলা সে তাঁর সঙ্গে দেখা করুক বা কথা বলুক, রামচরিত একেবারেই তা চান না। বিষ্ঠার এই পোকাটার সঙ্গে আদৌ কোনো পরিচয় আছে এবং লোকে তা জেনে ফেলুক, এটা তাঁর কাম্য নয়।

চৌপটলাল উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে থাকে। রামচরিত ক্ষেপে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যান্ত্রিক কোনো নিয়মে তাঁর চোখ ফের সেই মেয়েমানুষটির দিকে ফিরে যায়।

চৌপটলাল আগে থেকেই হয়ত তৃতীয় আওরতটা সম্পর্কে রামচরিতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। চাপা নীচু গলায় সে বলে, 'ও রতিয়া হুজৌর—'

রতি থেকে রতিয়া। বেশির ভাগ মানুষের নামই অকারণ অর্থহীন ; চেহারা বা স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু এই মেয়েমানুষটার বেলায় রতিয়া ছাড়া আর কোনো নামই যেন মানাত না।

চমকে মুখ ফেরান রামচরিত। কর্কশ গলায় বলেন, 'সকালবেলা বদ আওরতগুলোকে এখানে এনেছিস কেন? জানিস না এটা মন্দির—পুণ্যস্থান?'

সসম্ভ্রমে এবং ভীতমুখে 'মাফি মাঙে' চৌপটলাল, কিন্তু রামচরিতের প্রশ্নটার জবাব এড়িয়ে যায়।

রামচরিত ধমকে ওঠেন, 'কী হল? চুপ ক'রে আছিস কেন? বাতা বাতা—'

মুখ নীচু ক'রে আবছা গলায় চৌপটলাল বলে, 'উয়ো বহোৎ বুরা বাত হুজৌর। আপনার সামনে কী ক'রে বলি?'

চৌপটলালদের উদ্দেশ্যটা ভালো ঠেকছে না। কোনো মহৎ কারণে

যে তারা এখানে আসে নি তা বোঝা যায়। রামচরিত চিৎকার ক'রে ওঠেন, 'যত বুরা হোক, আমি শুনব।'

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে চৌপটলাল ভয়ে ভয়ে এবার যা জানায় তা এইরকম। রত্তিয়া আজ সন্ধ্যায় প্রথম দেহের ব্যওসা শুরু করতে যাচ্ছে। রামসীয়াজীকে প্রণাম ক'রে শুভ সূচনাটা করতে চায় সে। দেওতার আশীর্বাদ পেলে তার ব্যওসা নির্বিঘ্নে ঠিকমত চলবে। ভগোয়ানকে ভক্তি জানানো ছাড়া এখানে আসার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর—

শুনে রামচরিত একেবারে থ বনে যান। রামসীতাকে প্রণাম করার সঙ্গে বেশ্যাগিরি শুরুর কী কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে, ভেবে পান না। এই মন্দির একদা কী মহান কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর ষাট বছর পর এইসব কদর্য গিধের ছৌয়াগুলো কীভাবে এটা ব্যবহার করতে চাইছে, ভাবতেই শিউরে ওঠেন রামচরিত। তাঁর গায়ে কাঁটা দেয়। দু হাতে কান ঢেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চুপ হো যা ভুচ্চর, বিলকুল চুপ।'

ভয়ানক চমকে ওঠে চৌপটলাল। আরো কী বলতে যাচ্ছিল সে, বলা হয় না।

এদিকে হঠাৎ কিছু একটা মনে হতেই ভেতরে ভেতরে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন রামচরিত। কান থেকে হাত নামিয়ে শুধোন, 'তোরা রামসীতাজীর মন্দিরে ঢুকবি নাকি?'

চৌপটলাল শ্বাসটানার মতো আওয়াজ ক'রে বলে, 'নহী নহী হুজৌর। আমাদের মতো জানবরদের কি আর সে সৌভাগ হবে কোনোদিন। বাইরে সড়কে মাথা ঠেকিয়ে এখনই চলে যাব।'

রামচরিতের দুশ্চিন্তা কাটে; আর দাঁড়ান না তিনি। প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে চৌপটলালের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলেছেন। কেউ দেখে ফেলেছে কিনা কে জানে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সড়ক পেরিয়ে তিনি ওধারের মাঠে গিয়ে নামেন।

মাঠটা বেশ বড়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এখানে পড়তি কাঁকুড়ে জমি। কিছু কিছু সর্বন ঘাস, দু-চারটে আখাম্বা চেহারার সিসম কি পীপর গাছ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। মাটিতে পাথরের ভাগ বেশি বলে এ জমিটা প্রায় নিষ্ফলা। দরকারী কোনো গাছপালাই এখানে জন্মায় না।

আড়াআড়ি এই মাঠ পেরিয়ে কয়েক মিনিট হাঁটলেই রামচরিতের বিশাল কোঠি। পাকা রাস্তা দিয়ে গেলে ঢের ঘুরতে হয়; তাতে সময় লাগে অনেকটা। সময় বাঁচাতে রোজ সকালে মাঠ ভেঙে মন্দিরে চলে আসেন রামচরিত। ফেরেনও এই পথেই।

মাঠের আধাআধি পার হয়ে হঠাৎ তিনি ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকান। কোন অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাকাতে যেন বাধ্য করে। চৌপটলাল এবং বেশ্যাগুলো এই সকালবেলার পবিত্রতা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, বদবুতে ভরে দিয়েছে চারদিক। তবু রতিয়াকে আরেকবার না দেখে তিনি পারেন না। মেয়েমানুষটার দুর্দান্ত শরীর তীব্র আরকের মতো তাঁর রক্তে কী যেন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়েছে।

ওদিকে প্রণাম সেরে চৌপটলাল তার সঙ্গিনীদের নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। যতক্ষণ তাদের দেখা যায়, তাকিয়ে থাকেন রামচরিত। তারপর মাঠ ভেঙে আবার এগিয়ে যান।

রামচরিত যখন বাড়ির সামনে এসে পৌঁছন, বেশ রোদ উঠে গেছে। আকাশের গায়ে মিহি রেশমের মতো যে কুয়াশাটুকু আটকে ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই।

লখিনপুরা টাউনের ঘুম এর মধ্যে ভেঙে গেছে। রাস্তায় এখন প্রচুর লোকজন। আর চোখে পড়ছে গাদা গাদা সাইকেল রিকশা, টাঙ্গা, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি।

কোনোদিকে লক্ষ্য নেই রামচরিতের। সবকিছু ছাপিয়ে রতিয়ার মূরতটাই তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠছে। তাঁর মতো শ্রদ্ধেয়

নিষ্ঠাবান চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে পৃথিবীর সব চাইতে জঘন্য রেণ্ডিপাড়ার একটা বাজে বেশ্যার কথা ঘুণাক্ষরে চিন্তা করাও অন্যায়—নিষিদ্ধ পাপকাজের মতো । তবু কিছুতেই ভাবনাটাকে মাথা থেকে বার ক'রে দিতে পারছেন না।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে নিজের কোঠির প্রকাণ্ড গেটটার দিকে এগিয়ে যান রামচরিত।



প্রায় চার একর জায়গা জুড়ে চৌবেদের বিশাল দোতলা বাড়ি। দশ ফুট উঁচু মজবুত পাঁচীল দিয়ে চারদিকের বাউণ্ডারি ঘেরা। এই পাঁচীলের মাথায় সিমেন্টের ভেতর ভাঙা ভাঙা কাচের টুকরো পুঁতে দেওয়া হয়েছে। চোর ডাকাতের বিরুদ্ধে এটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

বাড়ির পুব দিকে ছ ইঞ্চি পুরু কাঠের গেট। তার জোড়া পাল্লায় পেতলের ভারী ভারী গুল বসানো। এসব অঞ্চলে বড় বড় জমি-মালিকদের বাড়িতে যেমন দেখা যায় রামচরিত্রের কোঠিতেও অবিকল সেই দৃশ্য। ছ ছটো চৌগাফাংলা প্রকাণ্ড চেহারার দারোয়ান গলায় আড়াআড়ি টোটার মালা ঝুলিয়ে আর ঘাড়ে দোনলা গাদা বন্দুক নিয়ে পালা ক'রে দিনরাত পাহারা দেয়। আত্মরক্ষার জন্য এই দারোয়ানদের প্রয়োজন হয়ত আছে কিন্তু তার চাইতেও বড় ব্যাপার, এরা রামচরিতের স্ট্যাটাস সিমবল।

মূল দোতলা কোঠিটার দেয়াল প্রায় দেড় হাত পুরু। বারান্দায় মোটা মোটা থাম। বাড়িটার বিশালত্বের তুলনায় দরজা-জানালাগুলো অনেক ছোট। সব মিলিয়ে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ যেন।

গোটা বাড়িটার দেয়ালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর থেকে যাবতীয় হিন্দু দেবদেবীর নানা রঙের ছবি আঁকা রয়েছে। আর আছে রামায়ণ মহাভারতের বাছা বাছা কিছু দৃশ্যের চিত্র। সেই সঙ্গে গীতা-উপনিষদের অগুনতি শ্লোকও লেখা রয়েছে। ছবিগুলো আহা মরি কিছু নয়,

চড়া রঙে স্থানীয় আর্টিস্টদের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া মোটা দাগের কাজ। বাড়িটার মাথায় 'কুলদেবা ঘর' বা পারিবারিক দেবতার মন্দির। রামচরিতদের আরাধ্য ঈশ্বর হলেন শিব।

এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন রামচরিতের ঠাকুরদা রামসিংহাসন। তিনি চৌবে বংশের প্রধান পুরুষ। বাড়িতে যাতে স্থায়ী আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় আবহাওয়া বজায় থাকে সেজন্য দেবদেবী এবং পৌরাণিক কাহিনীর ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। তবে পঞ্চাশ ষাট বছর আগের জেল্লা ত চিরকাল থাকে না। তাই তাঁর পরবর্তী জেনারেসনের রামশরণ এবং রামচরিত কয়েক বছর পর পরই আর্টিস্ট ডাকিয়ে ছবিগুলোর রং ফিরিয়ে নেন।

মোট পঞ্চাশখানা ঘর এই কোঠিতে। আর রামচরিতরা মানুষ হচ্ছেন মাত্র দু'জন। তিনি এবং স্ত্রী গোমতী। তবে নৌকর এবং নৌকরনী আছে গণ্ডা গণ্ডা।

স্বাধীন ভারতের শহরগুলোতে যেখানে মাথাপিছু বিশ বর্গফুট জায়গাও জোটে না, সেখানে রামচরিতরা দু'জনে চার একর জমিতে পঞ্চাশখানা ঘর দখল ক'রে আছেন।

অবশ্য এই পঞ্চাশটা ঘরের চল্লিশটাই বস্তা বস্তা ধান গেঁহু তিল তিসি চানা মকাই সর্ষে ইত্যাদিতে বোঝাই। এখান থেকে মাইলখানেক তফাতে লাজরখিয়া গাঁয়ে রামচরিতের প্রকাণ্ড খামারবাড়ি। সেখানে টিনের চালের যে বিরাট চোদ্দটা পাকা গুদাম রয়েছে তাতে হাজার বিঘা উৎকৃষ্ট দু-ফসলা জমির সব শস্য ধরে না। বাড়তি ধান গেঁহু-রাই-তিল-যব তাই বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলোতে ফী বছরই এনে রাখতে হয়। পরে দাম চড়লে বিক্রি ক'রে দেন রামচরিত।

বাড়িটার সামনে এবং পেছনে অনেকটা ক'রে ফাঁকা জায়গা। পেছন দিকে উঁচু উঁচু টিনের শেডের তলায় থাকে অনেকগুলো হাতি —প্রায় পঁচিশ তিরিশটা। এই হাতির কথা পরে। সামনের দিকের

এক ধারে দু-তিনটে ফীটন, কিছু ঘোড়া। আরেক ধারে অনেকগুলো দুধেল মোষ এবং গরু।

রামচরিত গেটের কাছে আসতেই ভোজপুরী দারোয়ান তটস্থ হয়ে ওঠে। বলে, 'হুজৌর আভিতক নহী আয়া—'

রামসীতা মন্দিরে যাবার সময় রামচরিত বলে গিয়েছিলেন, যে সব গণ্যমান্য লোকেদের আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা, তাঁরা এলে যেন যথেষ্ট খাতিরদারি ক'রে বসানো হয়। দারোয়ানের কথায় জানা গেল. এখনও তাঁরা আসেন নি। অবশ্য এত সকালে তাঁরা যে আসবেন না, সেটা মোটামুটি জানাই ছিল। তবু যদি এসে পড়েন তাই দারোয়ানকে বলে যাওয়া।

'ঠিক হ্যায়—' বলে বাড়ির ভেতরে চলে আসেন রামচরিত। সকালবেলায় তাঁর অনেক কাজ থাকে। সেগুলো জমিজমা বা বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার নয়। এ সব পরকালের কাজ।

রামচরিতদের বংশে সবাই দীর্ঘায়ু। লম্বা লম্বা উমরের জন্য তাঁরা বিখ্যাত। রামসিংহাসন পঁচাশি বছর বেঁচে ছিলেন, রামশরণ মারা যান একাশিতে। বাপ-ঠাকুরদার পরমায়ু পেলে এখনও পঁচিশ তিরিশ বছর তাঁর বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু তা আর কতটুকু সময়! জীবনের বেশির ভাগটাই ত কেটে গেছে। টাকাপয়সা সোনাদানা হাতিঘোড়া গাই-ভৈস ধানগেঁহু এবং অন্যান্য শস্য তাঁর অঢেল। এ সব ত আছেই, শরীরে বয়সের ঘুণ ধরার আগেই পরকালের জন্য কিছু 'পুণ' সঞ্চয় ক'রে রাখা দরকার। পরকাল এবং পুনর্জন্মে তাঁর অগাধ বিশ্বাস এই দুটি ব্যাপার যাতে একেবারে নিষ্কলঙ্ক এবং বিশুদ্ধ থাকে সেজন্য সারাক্ষণ তাঁর চোখকান খোলা। রামচরিতের ধারণা, অনবরত পুণ না করলে নরকবাস অনিবার্য। পরজন্মে হয়ত এই কারণে পবিত্র ব্রাহ্মণের ঘরের বদলে ধাঙড় চামারের ঘরে জন্মাবেন। কে বলতে পারে, পোকামাকড় হয়ে জন্মাবেন কিনা। সে-ও আরেক ধরনের

নরকযন্ত্রণা। নরকবাসে বড় ভয় রামচরিতের। মৃত্যুর পর প্রতি বার নতুন ক'রে পয়সাওলা 'শুধ্' ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি জন্মাতে চান।

সামনের ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে রামচরিত যখন বাড়ির ঢালা বারান্দায় উঠতে যাচ্ছেন সেইসময় দু'ধারের শেডের তলা থেকে গরু মোষ এবং ঘোড়াগুলো গলা মিলিয়ে ডাকতে থাকে। এই পোষা জীবগুলোকে তিনি খুবই ভালোবাসেন। অবলা প্রাণীদের প্রতি তাঁর বড় মায়া। ওদের ভাষা বোঝেন রামচরিত। গরু ঘোড়াগুলোও তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর ভাষাও ওরা বুঝতে পারে। দিনের অনেকটা সময় এদের সঙ্গে তাঁর চমৎকার কেটে যায়।

ওদের মতলবটা বুঝতে পারছিলেন রামচরিত। একটু আদর চাইছে। হাত তুলে তিনি বলেন, 'এখন না, পরে—পরে—' বলতে বলতে বারান্দায় উঠে যান। সেখান থেকে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একেবারে ছাদে—কুলদেবী ঘরের সামনে।

ছাদটা প্রকাণ্ড। এক মাথা থেকে আরেক মাথায় বার দুই দৌড়ে গেলে হাঁফ ধরে যায়। এর মধ্যেই ছাদের আলসেতে, রেলিঙের ওপর এবং নিচে অজস্র পাখি এসে জমেছে। চোটা, শালিক, শুগা, বুলবুলি। সেই সঙ্গে কাক ত আছেই। রামচরিতের জন্যই তারা যেন অপেক্ষা করছিল। এবার কয়েক শ' পাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিল।

এই পাখিগুলোও রামচরিতের বড় প্রিয়। তাঁর পোষা জীবগুলোর মতোই এদেরও তিনি খুব ভালবাসেন। যদিও এই পাখিরা স্বাধীন, বনেজঙ্গলে, অসীম নীলাকাশে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু রোজ সকালবেলায় ঠিক তারা এই ছাদে চলে আসে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মতো এ এক অভ্রান্ত নিয়ম।

রতিয়ার জন্য মাথার ভেতর যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল, আস্তে আস্তে সেটা জুড়িয়ে আসছে। সামান্য হেসে তিনি বলেন, 'থোড়া সবুর। আমি আসছি।'

রামসীতা মন্দিরের মতো কুলদেবী ঘরেরও একজন বাঁধা পুরোহিত আছে। নন্‌কিশোর ঝা। নির্ভুলভাবে মধ্যবয়সী নন্‌কিশোর এখন ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভেতরে উঁচু বেদীর ওপর নীল রঙের ধ্যানস্থ শিবের মূরত। পাথরের বেশ বড় বিগ্রহ। হাঁটু গেড়ে বসে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন রামচরিত। বছরের পর বছর রামসীতার পর কুলদেওতা শিউশঙ্করকে প্রণাম ক'রে চলেছেন তিনি।

একসময় উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন রামচরিত।

এর মধ্যে আরেক অভ্রান্ত নিয়মে কখন যেন একটা নৌকর বড় পেতলের পরাতে দু আড়াই কিলোর মতো উৎকৃষ্ট গেঁহু চাল যব এবং মকাইর দানা এনে ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিদিন শিবশঙ্করের মূরতকে প্রণাম ক'রে কুলদেবী ঘর থেকে বাইরে এলেই ঐ নৌকরটাকে এখানে দেখা যাবে। একেবারে যান্ত্রিক কোনো পদ্ধতি যেন।

রামচরিতকে দেখে নৌকরটা ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে। এদিকে পাখিগুলোর চেঁচামেচি বিশ গুণ বেড়ে গেছে। রামচরিত পরাত থেকে মুঠো মুঠো ধানগেঁহু তুলে ছাদময় ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। নৌকরটা তাঁর পেছন পেছন ছায়ার মতো নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। চেঁচামেচি এবং ডানার ঝটাপটির আওয়াজে চারদিকে ভরে যায়। দু-একটা পাখি রামচরিতের কাঁধে এবং হাতে এসেও বসে।

পাখিদের দানা খাওয়ানোটাকে একটা পুণ্যকাজ বলে মনে করেন রামচরিত। তাঁর ধারণা, ঈশ্বরের সৃষ্টি পশুপাখিদের সেবা করলে পরমাতমা তুষ্ট হন।

দানা ছড়াতে ছড়াতে বাড়ির পেছন দিকের আলসের কাছে চলে আসেন রামচরিত। এখান থেকে নিচে হাতির শেডগুলো দেখা যায়। এই মুহূর্তে মাহুত এবং নৌকরেরা জন্তুগুলোর গা পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে।

হাতিগুলো রামচরিতকে দেখতে পেয়েছিল। শুঁড় তুলে খুশিতে তারা চেঁচাতে থাকে। হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার ক'রে রামচরিত বলেন, 'পরে তোদের কাছে যাব। এখন চেল্লাচিল্লি করিস না।'

পাখিদের দানা খাওয়াতে আধ ঘন্টার মতো লাগে। তারপর দোতলায় নেমে সোজা নিজের শোবার ঘরে চলে আসেন রামচরিত।

ঘরটা বিরাট, তিরিশ ফুট বাই কুড়ি ফুট। এখানকার আসবাবপত্র — খাট, আয়না-বসানো কাঠের আলমারি, আলনা, গদিওলা সোফা —সমস্ত কিছুই ভারী ভারী এবং পুরনো আমলের। সেই সঙ্গে নতুন ফ্যাশনের ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবিল, কুশনটুশনও রয়েছে। পুরনোর সঙ্গে নতুন মিশিয়ে সব জবড়জং ক'রে রাখা হয়েছে।

পুরো ঘরটা জিনিসপত্রে ঠাসা। দু ধারে দুই দেয়ালের ধার ঘেঁসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মকরমুখো দুটো খাট। তার ওপর তিনফুট পুরু জাজিম এবং বিছানা। একটা খাট রামচরিতের, অন্য খাটটা গোমতীর। স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় শোন না।

এ ঘরে কম ক'রে গোটাদশেক আলমারি ত হবেই। লোহার সিন্দুক তিনটে। একটা বইয়ের আলমারি। সেটা বেদ-উপনিষদ-গীতা-চণ্ডী থেকে শুরু ক'রে গত তিরিশ চল্লিশ বছরের পঞ্জিকায় বোঝাই। সব মিলিয়ে শোবার ঘরটা যেন গুদাম।

ফী বছর রামনবমীর দিন দেয়ালে পাঁচটা ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। এভাবে সবগুলো দেয়ালে শুধু সিঁদুর আর সিঁদুর। পুরনো দাগগুলো শুকিয়ে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। নতুনগুলোর রং এখনও টকটকে।

ঘরে ঢুকে রামচরিত দেখলেন, গোমতী তাঁর বিছানায় বসে তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাই তুলছেন। অর্থাৎ এই সবে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। গোমতী খুবই ঘুমকাতুরে। রোজ ভোরে রামচরিত যখন স্নান সেরে রামসীতা মন্দিরে যান তখন তিনি ঘুমোচ্ছেন। ফিরে এসে কোনোদিন দেখেন তাঁর ঘুম ভেঙেছে। কোনোদিন বা ডাকাডাকি ক'রে তাঁকে তুলতে হয়।

হাই তোলা এবং তুড়ি বাজানোর পর দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে গোমতী বিড় বিড় করেন, 'সীয়ারাম সীয়ারাম। জয় শিউশঙ্কর।' তারপর স্বামীর দিকে ফিরে শুধোন, 'দেওতা দর্শন হল?' এটা নেহাতই কথার কথা। রামসীতা এবং কুলদেওতার প্রণাম না সেরে রামচরিত যে এ সময় ফেরেন না সেটা তাঁর জানা।

রামচরিত বলেন, 'হাঁ।'

খাট থেকে নামতে নামতে গোমতী বলেন, 'তুমি কাপড়া-উপড়া বদলাও। আমি মুখ ধুয়ে নাহানা সেরে আসি।' এই ঘরের লাগোয়া আধুনিক স্টাইলে স্নানের ঘর, যাকে বলা হয় অ্যাটাচড বাথ। সেদিকে যেতে যেতে গলা চড়িয়ে গোমতী তাঁর খাস নৌকরনীকে তাড়া লাগান, 'এ বিরজিয়া, বড়ে সরকার লৌটা হ্যায়।'

বিরজিয়াকে রামচরিতের ফেরার খবরটুকু দেওয়াই যথেষ্ট। এরপর কী কী করতে হবে সে জানে। পাশের ঘর থেকে তার গলা ভেসে আসে, 'সব ঠিক ক'রে রেখেছি। আতি হ্যায়।' বিরজিয়ার গলার স্বর তীক্ষ্ণ, ছুঁচের মতো কানের পর্দায় বিঁধে যায়।

গোমতী আর কিছু বলেন না; পরিষ্কার পাটভাঙা শাড়ি জামা এবং তোয়ালে নিয়ে নাহানা-ঘরে ঢুকে যান।

গোমতীর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। এর মধ্যেই বেজায় মুটিয়ে গেছেন, গায়ে পর্যাপ্ত মেদ। বেঢপ শরীরে ছিরিছাঁদ বলতে কিছু নেই। ঘন ক'রে দুধ জ্বাল দিলে যেমন হয় তাঁর রং অবিকল তাই। মসৃণ ত্বকে হলুদ আভা যেন ফুটে বেরোয়। এমন বিপুল চেহারা, মুখটা কিন্তু ভারি কচি। ঘন কালো চুল প্রায় সারাক্ষণই পিঠময় ছড়িয়ে থাকে।

ইচ্ছে করলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সোনাদানা হীরেমুক্তোয় মুড়ে রানী সেজে থাকতে পারেন গোমতী। কিন্তু দামী গয়না জেবর বা জমকালো সাজসজ্জা সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। নাকের পাটায় হীরের একটি নাকছাবি, কানে করণফুল, গলায় সরু হার,

হাতে দু গাছা ক'রে চুড়ি এবং দুই পায়ের মাঝখানের আঙুলে রুপোর চুটকি ছাড়া আর কিছু নেই। মোটামুটি একটা ঢলঢলে জামা আর শাড়ি ঢিলেঢালা ক'রে পরে থাকেন।

গোমতীর আগ্রহ না থাকলেও কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রামচরিতের মনে যথেষ্ট পরিমাণেই শখশৌখিনতা ছিল। কলকাতা থেকে, বেনারস থেকে দামী দামী শাড়ি আর হীরে জহরতের নতুন নতুন গয়না আনিয়ে পরবার জন্য প্রথমে সাধাসাধি, পরে জোরজার এবং রাগারাগিও করতেন। গোমতী দু হাত নেড়ে নিস্পৃহ মুখে বলতেন, 'ইচ্ছা করে না। মনকা রং বদল গিয়া—' অগত্যা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন রামচরিত।

গোমতীর 'মনকা রং বদলে'র হয়ত কারণ আছে। তের বছর বয়সে রামচরিতের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তারপর থেকে একনাগাড়ে দেড় দু বছর বাদে বাদে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন। পনের বছরে সাত সাত বার পেটে ছোঁয়া এলেও কোনোটাই বাঁচে নি। বেশির ভাগই পেটের ভেতর নষ্ট হয়ে গেছে। দুটো মরা অবস্থাতেই জন্মেছিল। গর্ভধারণের ক্ষমতা যে তাঁর ছিল তা প্রমাণ হয়ে গেছে। কিন্তু বাচ্চাগুলো একটাও কেন টিকল না সেটা বিরাট এক প্রশ্ন। তাঁর না রামচরিতের, কার বীজ পোকায়-খাওয়া তা অবশ্য কোনোদিন জানা যায় নি। আভাসে-ইঙ্গিতে দু-একবার পাটনা কি কলকাতায় গিয়ে 'বিলাইত' ফেরত ডাক্তার দেখাবার কথা বলেছিলেন গোমতী। শুনে জিভ কেটে কানে আঙুল দিয়ে 'ছিয়া ছিয়া' করেছেন রামচরিত। ডাক্তারের জাত কী হবে কে জানে! সেটা ত আছেই, তা ছাড়া শুদ্ধ চতুর্বেদী বংশের 'ঘরকা লছমী'র গায়ে পরপুরুষ হাত ঠেকাবে, এটা ভাবাও নরকবাসের তুল্য। কাজেই ব্যাপারটা অপার রহস্যই থেকে গেছে।

এদিকে এতগুলো মরা বাচ্চার জন্মদানের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। তের বছরের ছিপছিপে সতেজ লতার মতো যে মেয়েটি এবাড়ির 'লছমী' হয়ে এসেছিল, হরিণের মতো যে হাওয়ার আগে

উড়তে পারত, আটাশ বছরে তার সেই হাল্কা মেদহীন চেহারায় আচমকা চর্বির থাক জমতে লাগল। চর্বিতে চর্বিতে সরু কোমর, নিটোল গলা এবং শরীরের যাবতীয় কমনীয় খাঁজ এবং রেখাগুলি ঢেকে বিশ্রী বেঢপ কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেল। আটাশ বছরেই গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত মেদের ঢিবি হয়ে উঠল।

শরীরটাই শুধু নয়, মনের পরিবর্তন হল আরো ভয়ঙ্কর। বিরাট কোঠি, স্বামী, টাকা-পয়সা, বিপুল সম্পত্তি, হীরে জেবর, অঢেল ধান গেঁহু, বিখ্যাত শ্বশুরবাড়ির জন্য অহঙ্কার—এসব নিয়ে মনটা এক বগগা দৌড়তে দৌড়তে আচমকা ধাক্কা খেয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ল। যখন গোমতী ব্যাপারটা একটু সামলে উঠলেন তখন ভেতরে ভেতরে একেবারে বদলে গেছেন। মাত্র উনত্রিশ বছরে সাঙ্ঘাতিক বাতিকে পেয়ে বসল তাঁকে। সর্বক্ষণ শুচিবাই। স্বামীর জন্য নতুন খাট আনিয়ে আলাদা শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। দু-চার মাস পর পরই তীর্থে যেতে লাগলেন।

স্ত্রী তীর্থে যান, তাতে আপত্তি ছিল না রামচরিতের। কিন্তু ভিন্ন বিছানার ব্যাপারে তাঁর মাথায় আগুন ধরে গেল। বললেন, 'এ সব কী হচ্ছে? আলাদা শুলে ছোঁয়া হবে কী ক'রে? বাচ্চা পয়দা না হলে এত পাইসা এত জমিনের কী হাল হবে? আমাদের মৌত হলে গয়াজীতে পিণ্ডি দেবে কে?'

কোনো কারণেই মাথা গরম হয় না গোমতীর। অসীম সহিষ্ণুতা তাঁর। স্বামীর মুখ থেকে সন্তান পয়দার মতো নোংরা কথা বেরিয়েছে। তাই গঙ্গাপানি ছিটিয়ে রামচরিতের মুখ শুধ্‌ ক'রে নিতে নিতে ফিক ক'রে হেসে ফেলেছেন, 'সাতবার ত জন্মাল, তাতে লাভ কী হল? আর জরুরত নেই।'

জরুরত নেই বললেই ব্যাপারটা মিটে যায় না। পিণ্ডি খাবার জন্য পূর্বপুরুষেরা গয়াতে লাইন দিয়ে বসে আছে। কাজেই জোর করেই গোমতীর বিছানায় ঢুকতে চেয়েছেন রামচরিত। কিন্তু পাশ

ফিরে শুয়ে শরীর পাথরের মতো শক্ত ক'রে রেখেছেন গোমতী। রামচরিত উত্তেজিত চাপা গলায় বলেছেন, 'ক্যা হুয়া ? এধারে ফের।'

গোমতী বলেছেন, 'নেহী । পনদ্র সাল আমাকে নিয়ে ময়দা ডলেছ। এখন ওসব ভাবলে 'ঘিন' হয়, উল্টি (বমি) আসতে চায়। যাও, আপনা বিস্তারামে চলা যাও।'

'একটা ছোয়া হবে না আমাদের ? বংশটা বিলকুল খতম হয়ে যাবে ?'

'ছোয়া চাইলে আরেকটা শাদি ক'রে ফেল।'

চৌবে পরিবারের পুরুষেরা বংশানুক্রমে একনিষ্ঠ। কেউ একটির বেশি বিয়ে করেন নি। কৌলিক প্রথা বা নিয়ম বজায় রাখতে রামচরিতও দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনেন নি। যদিও হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে গেছে, স্ত্রী সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকলে কোনো হিন্দুই নতুন ক'রে বিয়ে করতে পারে না, তবু রামচরিত ইচ্ছে করলেই একটার জায়গায় দশটা স্ত্রী রাখতে পারতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের যেদিকে পার্লামেণ্ট, হিন্দু কোড বিল, আইন-আদালত, সংবিধান, তার উল্টোদিকে বিহারের এই সব অঞ্চল।

কাজেই ধীরে ধীরে শরীরের সব দাহ, রক্তের ভেতরকার আদিম আগুন কবে নিভে গেছে, টের পান নি রামচরিত। ইদানীং কয়েক বছর ধরে তাঁর বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারীর জীবন।

এর মধ্যে পরনের থানটা পালটে ধুতি এবং জামা পরে নিয়েছেন রামচরিত। এদিকে মুখ ধুয়ে, স্নান সেরে শাড়িটাড়ি বদলে নাহানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন গোমতী। সকালে চোখ মেলবার পর থেকেই তাঁর স্নান শুরু হয়। দিনে অন্তত দশ বার।

এখন খুব আস্তে চাপা অনুচ্চ স্বরে মুখস্থ শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে ওধারের কুলুঙ্গি থেকে গঙ্গাজলের ছোট কলসী পেড়ে আনেন গোমতী। বাঁ হাতের চেটোতে খানিকটা জল ঢেলে ডান

হাতের আঙুল দিয়ে রামচরিতের দিকে ছিটোতে থাকেন। স্বামী বাইরে থেকে ফিরলেই এভাবে গঙ্গাজলে তাঁকে 'শুধ্' ক'রে নেওয়া হয়।

নিস্পৃহভাবে স্ত্রীর কার্যকলাপ দেখতে দেখতে আচমকা রতিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কুল দেওতাকে প্রণাম, পাখিদের দানা খাওয়ানো ইত্যাদি পুণ্যের কাজে তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে আওরতটার কথা খেয়াল ছিল না। মনে মনে রতিশক্তিহীন বেঢপ বাতিকগ্রস্ত গোমতীর পাশাপাশি রতিয়ার দুর্দান্ত লোভনীয় এবং উত্তেজক দেহটিকে দাঁড় করিয়ে দেখতে দেখতে মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে রামচরিতের। তিনি জানেন 'ঘরকা লছমী' সতী স্ত্রীর সঙ্গে একটা জঘন্য রেণ্ডিখানার নোংরা বেশ্যার তুলনা করা ভয়ানক পাপ। জোর ক'রে মাথা থেকে রতিয়াকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন রামচরিত।

এধারে গোমতীর শুদ্ধিকরণ যখন চলছে সেইসময় তাঁর খাস নৌকরনী বিরজিয়া শ্বেতপাথরের গেলাসে আখের রস আর কালো পাথরের থালায় মেওয়া-মিছরি-পেস্তা-খেজুর ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে আসে। রোজ সকালে এটুকুই তিনি খান। একেবারে সাত্ত্বিক ভোজন। বেলা আরেকটু চড়লে দ্বিতীয় দফা ভোজন করবেন তিনি। তখনকার খাবারের তালিকায় থাকবে পুরী ভাজি লাড্ডু বুন্দিয়া এবং ক্ষীর।

খেতে খেতে অন্যমনস্কর মতো রামচরিত বলেন, 'সেই কথাটা মনে আছে?'

গোমতী বলেন, 'হাঁ হাঁ, জরুর। চারপাশের বড়ে বড়ে আদমীরা আসবেন ত?'

'হাঁ।'

'তিন চার দিন ধরে এক কথা বলে বলে কানের পর্দা ফুটো ক'রে দিচ্ছ। ভুলতে পারি?' গঙ্গাজল ছিটানো হয়ে গিয়েছিল। কলসীটা ফের কুলুঙ্গিতে রেখে স্বামীর কাছে ফিরে এলেন গোমতী।

রামচরিত বলেন, 'বলতে ত হবেই। দিনরাত গঙ্গাপানি ছিটিয়ে দুনিয়ার সব কিছু শুধ্ করা ছাড়া তোমার কি আর কোনোদিকে হুঁশ থাকে! আমাকে আবার বেরুতে হবে। তুরন্ত ফিরে আসব। এর ভেতর ওঁরা এসে গেলে চায়পানি, মিঠাই পাঠিয়ে দিও।'

গোমতী জানান, অতিথিদের খাতিরদারিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না। তারপর কী ভেবে শুধোন, 'ওঁরা কী জন্যে আসছেন?'

রামচরিত বলেন, 'সামনে হিন্দু ধরমের নাকি বড় বিপদ। সেই ব্যাপারেই কথাবার্তা বলতে আসছেন।'

গোমতীকে ঈষৎ চিন্তিত দেখায়। বলেন, 'কীসের বিপদ?'

নিশ্চিতভাবে কিছু জানেন না রামচরিত। বলেন, 'হোগা কুছ।'

একটু চিন্তা ক'রে গোমতী বলেন, 'ষাট পঁয়ষট সাল আগে তোমার দাদার (ঠাকুরদা) আমলে হিন্দুরা মুসলমান আর খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছিল। তেমন কিছু হচ্ছে নাকি?'

'সেরকম কিছু শুনি নি। এই এলাকার মানুষ ধরম বদল করলে আমার কানে আসত।'

'তবে?'

'ওঁদের কাছে না শুনে কিছু বলতে পারব না।'

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রামচরিত বিরজিয়ার হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উঠে পড়েন। তারপর দোতলা থেকে সোজা নিচে। এবার তিনি দ্বিতীয় দফা পুণ্যের সন্ধানে বেরুবেন।



সামনের ফাঁকা জায়গায় এর মধ্যে একটা ফীটনে তেজী ঘোড়া জুতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। গাড়িটার ওপর দিকটা খোলা, মাথায় ছাদ বা ছাউনি নেই।

ফীটনটার গা ঘেঁসে চারটে নৌকর বড় বড় সিলভারের ডেকচিতে চাপাটি ভাজি কলা শশা শুখা ডাল বোঝাই ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি দুটো পহেলবানকে দেখা যাচ্ছে (রামচরিত এদের পোষেন)। ওদের হাতে লোহার নাল-বসানো তেল-চুকচুকে লাঠি।

রামচরিতকে দেখে দু ধারের শেডের তলা থেকে গরুমোষ এবং ঘোড়াগুলো সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। তাদের একটু আদর চাই। যত বার তারা রামচরিতকে দেখে ততবার খুশিতে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করে।

'আভি নেহী। সামকো (সন্ধেবেলায়)। এখন আমার জরুরি কাজ আছে। তোরা ত সব জানিস।' বলতে বলতে ফীটনে উঠে বসেন রামচরিত।

সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ান আজীবলাল ঘোড়ার পিঠে আলতো ক'রে ছপটি হাঁকায়। তালিম-দেওয়া ঘোড়া দুলকি চালে গেটের বাইরের রাস্তায় চলে যায়।

এদিকে চার নৌকর ডেকচি মাথায় নিয়ে ফীটনের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করেছে। লাঠিওলা পহেলবান দুটোও তাদের পাশাপাশি

চলতে থাকে। এর আগে যা যা ঘটেছে, যেমন রামসীতা এবং কুলদেওতা দর্শন, পাখিদের দানা খাওয়ানো ইত্যাদি ব্যাপারের মতো এটাও যান্ত্রিক নিয়মেই ঘটে যায়।

বাইরে এসে ডানদিকের পাকা সড়ক ধরে রামচরিতের ফীটন ছুটতে থাকে। রামচরিত কখনও শিরদাঁড়া খাড়া ক'রে, কখনও ডাইনে বা বাঁয়ে ঝুঁকে গভীর আগ্রহে চারদিক লক্ষ্য করতে থাকেন।

রাস্তায় এখন লোকজন প্রচুর। তা ছাড়া অজস্র গাড়িঘোড়াও চোখে পড়ছে। তারা সবাই সসম্ভ্রমে সরে সরে রামচরিতের ফীটনের জন্য জায়গা ক'রে দেয়। কেউ কেউ তাঁর উদ্দেশ্যে হাতজোড় ক'রে বলে, 'বড়ে পুণ্যাত্‌মা আদমী চৌবেজী।'

কোনোদিকে নজর নেই রামচরিতের। এধারে ওধারে চনমন ক'রে দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর চোখেমুখে আলোর ঝলক খেলে যায়। কাম্য বস্তুটি তিনি পেয়ে গেছেন। পাহাড়ের মতো দুটো কালো ধর্মের ষাঁড় হেলেদুলে উল্টো দিক থেকে আসছে। রামচরিত চেঁচিয়ে ওঠেন, 'রুখ যা, রুখ যা—'

ফীটন থেমে যায়। রামচরিত নেমে পড়েন। ধর্মের ষাঁড় দুটো তাঁকে চেনে। তারা স্পীড বাড়িয়ে দৌড়তে থাকে।

যে নৌকরেরা ডেকচি মাথায় চাপিয়ে পেছন পেছন আসছিল তারাও দাঁড়িয়ে পড়ে। রামচরিত ডেকচি থেকে একগোছা মোটা মোটা চাপাটি, ভাজি, কলা, ডাল এবং শশা বার করতে না করতেই ষাঁড় দুটো কাছে চলে আসে। স্বয়ং শিউশঙ্করের বাহন দুটোর গায়ে সন্তর্পণে হাত ঠেকিয়ে রামচরিত প্রথমে প্রণামটা সেরে নেন। তারপর চাপাটি কলা টলা দুই হাতে দুই ষাঁড়ের মুখের সামনে ধরে গদগদভাবে বলেন, 'ভোজন কর লে—'

ষাঁড়েরা প্রায় ছোঁ মেরেই লোভনীয় খাদ্যগুলো জিভ দিয়ে টেনে নিয়ে চিবুতে থাকে। দেখতে দেখতে রামচরিতের দু চোখে স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটে ওঠে। ওদের খাওয়া হলে আবার ফীটনে চড়ে রামচরিত

হাঁকেন, 'চালা—'

গাড়ি চলতে থাকে। খেতে খেতেই ষাঁড় দুটো তার পিছু নেয়।

খানিকটা যেতে না যেতেই দশ বারোটা রাস্তার কুকুর চোখে পড়ে। রামচরিতকে দেখামাত্র চেঁচাতে চেঁচাতে তারা ছুটতে শুরু করে। জন্তুগুলো তার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল। রামচরিতও ফীটন থামিয়ে তাদের ভোজন করাতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর ফের গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি। কুকুরগুলো, নৌকরেরা, পহেলবানরা এবং আগের ষাঁড় দুটো ফীটনের পেছন পেছন হাঁটতে থাকে।

এই শহরে অগুণতি বেওয়ারিশ ষাঁড় এবং কুকুর। কয়েক গজ এগুতে না এগুতেই আবার ক'টা ষাঁড় চোখে পড়ে। রামচরিত তাদের প্রণাম ক'রে সযত্নে নিজের হাতে খাওয়ান। খাওয়া চুকলে এই ষাঁড়গুলো আগের আগের কুকুর এবং ষাঁড়েদের সঙ্গে রামচরিতের পিছু নেয়।

এইভাবে রাস্তার তাবত অনাথ জন্তুকে খাওয়াতে খাওয়াতে এগিয়ে চলেন রামচরিত। এমন কি নাথু ধোবির যে ঠ্যাং-ভাঙা অকেজো বুড়ো গাধা দুটো, যাদের নাথু অনেক দিন আগেই বাতিল ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে তাদেরও অবহেলা করেন না রামচরিত। গাড়ি থামিয়ে দুই গাধাকে যথেষ্ট খাতিরদারি ক'রে খাওয়ান। দুনিয়ায় যাদের দেখার কেউ নেই, ভাগোয়ান ব্রহ্মার সৃষ্টি সেইসব হতভাগা জীবগুলির প্রতি তাঁর অপার করুণা।

যতই রামচরিতের ফীটন এগিয়ে চলে, পেছনের শোভাযাত্রা ততই বড় হতে থাকে। অবশ্য তাঁর পোষ্য এই জন্তুগুলো কেউ শান্ত বা সুবোধ নয়। চিৎকার এবং কামড়া-কামড়ি করতে করতে সারা রাস্তা মাতিয়ে তারা চলতে থাকে।

যেতে যেতে হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে যায়। অবশ্য রোজই এমন ঘটনা দু-চারটে হয়েই থাকে। সে জন্য রামচরিত আটঘাট

বেঁধেই বাড়ি থেকে বেরোন।

টাউনের মাঝামাঝি বাজার মহল্লায় এসে আজ যখন সাতটা ধর্মের ষাঁড়কে পবিত্র মনে একসঙ্গে খাওয়াতে খাওয়াতে রামচরিতের ঘাম ছুটে যাচ্ছে সেই সময় অনেকগুলো হতচ্ছাড়া চেহারার সিড়িঙ্গে হাড্ডিসার ভিখমাঙোয়া (ভিখিরি) কাছে এসে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু ক'রে দেয়, 'সরকার একগো চাপাটি দো। ভগোয়ান রামজী তেরে ভালাই করেগা—'

কেউ গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলে, 'বহোত ভুখ। দো রোজ কুছ নায় মিলা। বহোত ভুখ—'

বিরক্ত মুখে চেঁচিয়ে ওঠেন রামচরিত, 'ভাগ্ ভাগ্—' অনাথ অসহায় পশুদের খাদ্যে তিনি মানুষকে ভাগ বসাতে দেবেন না। তাঁর লজিকটা এইরকম। মানুষ করেকর্মে হাজারটা ফিকির বার ক'রে পেট চালাতে পারে। কিন্তু এইসব বে-সাহারা অবোলা পশুদের ত সে উপায় নেই।

ভিখমাঙোয়ারা ভাগে না, বরং তাদের চেঁচামেচি, ঘ্যানর ঘ্যানর আরো বেড়ে যায়।

এবার ক্ষেপে ওঠেন রামচরিত। লাঠিওলা পহেলবানদের উদ্দেশে বলেন, 'পুতলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভুচ্চরের ছৌয়াগুলোকে মেরে হটিয়ে দে—'

জোড়া পহেলবান ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ভিখমাঙোয়াদের অনেক দূরে ভাগিয়ে দেয়। শাসায়, ফের কাছাকাছি এলে লাঠির বাড়িতে তাদের মাথা ফাঁক ক'রে ফেলবে।

এরপর নির্বিঘ্নে ষাঁড় ভোজন শেষ ক'রে আবার যখন রামচরিত কীর্টনে উঠতে যাবেন সেই সময় 'হুজোর—' শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

খানিকটা দূরে বকের মতো লম্বা লম্বা পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠাণ্ডিলাল। লোকটা আখাম্বা ঢ্যাঙা তালগাছ যেন।

গাঁট পাকানো সিড়িঙ্গে হাত-পা। গায়ে মাংসের চেয়ে হাড়ই বেশি। ভাঙাচোরা মুখ, ট্যারাবাঁকা চেহারা। গাল এবং চোখ গর্তে ঢোকানো। মাথায় জট-পাকানো-ধুলো মাখা ঝাঁকড়া চুল। মুখময় খাপচা খাপচা কাঁচা পাকা দাড়ি। বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। পরনে তালিমারা ঠেঁটি ফুর প্যাণ্ট (ফুল প্যাণ্ট) আর ছেঁড়া জামা। পায়ে টায়ার-কাটা চটি। হাতে চোঙার মতো উদ্ভট ধরনের একটা বাঁশি। ঠাণ্ডিলাল বলে 'ফলুট', অর্থাৎ কিনা ফ্লুট। এই ফলুট্‌টা সারাক্ষণ তার হাতে হাতে ঘোরে। মাঝে মাঝে ওটা আকাশের দিকে তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে এমন অদ্ভুত আওয়াজ বার করে যে দারুণ অস্বস্তি হতে থাকে। মনে হয় ফলুট বাজিয়ে কারো উদ্দেশে সে মারাত্মক ঘৃণা এবং বিদ্রূপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ঠাণ্ডিলাল বিখ্যাত লোক। এককালে নৌটঙ্কীর দলে ছিল নাম-করা বাঁশি বাজিয়ে। ক'বছর আগে বুকের দোষ এবং মাথার গোলমাল হওয়ায় তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

লোকটা অচ্ছুৎ। ত্বনিয়ায়-কেউ নেই তার, কিচ্ছু নেই। এমন কি মাথা গোঁজার মতো এক ধুর জমিও না। নৌটঙ্কীর দল থেকে ভাগিয়ে দেবার পর লখিনপুরায় এসে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়; রাত্রিবেলা মাঠঘাট কি গাছতলায় পড়ে থাকে। কেউ কিছু দিলে খেল, না দিলে ভুখাই কাটিয়ে দিল। তার পিছুটান নেই, বর্তমান সম্পর্কে সে উদাসীন, ভবিষ্যৎ নিয়েও মাথা ঘামায় না।

ঠাণ্ডিলাল একাই না, তার পেছনে হতচ্ছাড়া চেহারার পাঁচ ছ'টা ছোট ছেলেও রয়েছে। তাদের বেশির ভাগেরই খালি গা, পরনে ছেঁড়া বা তালিমারা দড়ির ইজের। দেখেই টের পাওয়া যায়, এই পৃথিবীতে নিতান্ত অবহেলায় এবং অযত্নে আগাছার মতো তারা বেড়ে উঠছে।

রামচরিত ঠাণ্ডিলালের সঙ্গী ঐ ছোকরাগুলোকে চেনেন। ওরা বেওয়ারিশ এবং জারজ। লখিনপুরার বেশ্যাটুলিতে তারা জন্মেছে,

থাকেও সেইখানেই। ওদের নির্দিষ্ট এক একটা মা হয়ত আছে কিন্তু বাপের ঠিকঠিকানা নেই। বেশ্যাদের পেটে জন্মের বীজটি পুঁতে দিয়ে তারা সরে পড়েছে।

আজ দিনটা শুরু হয়েছে ভালোই। সকালে রেণ্ডির দালাল এবং বেশ্যা দেখেছেন। এখন অচ্ছুৎ মাথাখারাপ ফলুটবালা দেখলেন। সেই সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা বেজন্মার মুখও তাঁকে দর্শন করতে হল। এমন দুর্ঘটনা জীবনে আর কখনও ঘটে নি। ঘেন্নায় তাঁর শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে।

তা ছাড়া সেই অস্বস্তিটাও রামচরিতের মধ্যে পাক খাচ্ছে অবিরত। ফলুট থেকে ঠাণ্ডিলাল তাঁকে লক্ষ্য ক'রে হয়ত প্যাঁ প্যাঁ আওয়াজ বার ক'রে বসবে! এই শহরের অনেক মান্যগণ্য লোকের উদ্দেশে বহুবার ফলুট বাজিয়েছে সে। তাঁদের মধ্যে আছেন কর্পূরী দুবে, নাথমল চৌরাসিয়া, রণধীর সিং, এমনি অনেকে। অবশ্য কর্পূরীর সুদখোর হিসেবে, নাথমলের কালোবাজারী হিসেবে এবং রণধীরের দুশ্চরিত্র লম্পট হিসেবে যথেষ্ট বদনাম আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রামচরিতকে তাক ক'রে ঠাণ্ডিলাল ফলুট ফোঁকে নি।

লোকটার মাথার গোলমাল, সে পাগল। কখন কী খেয়ালে কোন ধরনের ঝঞ্ঝাট বাধাবে, আগে থেকে বোঝার উপায় নেই। নিয়ম অনুযায়ী পাগলের কাণ্ডকারখানা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাকে হিসেবের বাইরে রাখাই উচিত।

কিন্তু ঠাণ্ডিলাল সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন থাকা বোধহয় যায় না। কেননা বেছে বেছে বিশেষ বিশেষ লোকের পেছনে সে ফলুট বাজায় কেন, সেটা বিরাট এক প্রশ্ন। রামচরিতের মনে হয় লোকটা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা ঠিক নয়। পাগলামিটা হয়ত আসলে ওর ভড়ং, ভেতরে ভেতরে একেবারে হাড় পর্যন্ত ওর বজ্জাতিতে ঠাসা। ধূর্ত শিয়ার বা গিধ একটা।

ঘাড় বাঁকিয়ে স্থির চোখে রামচরিতকে দেখছিল ঠাণ্ডিলাল। হলদে

ট্যারাবাঁকা দাঁত বার ক'রে সে বলে, 'মর গিয়া রে, মর গিয়া—'

রামচরিতের চোখ কুঁচকে যেতে থাকে। তিনি কিছু বলেন না।

ঠাণ্ডিলাল ফের বলে, 'রামসীয়ার মূরতকে পরণাম ক'রে স্থবে একবার পুণ করেছেন। এখন জানবর ভোজন করিয়ে ছুসরা বার পুণ করতে বেরিয়েছেন সরকার?'

লখিনপুরা টাউনের প্রতিটি মানুষের গতিবিধির খবর রাখে ঠাণ্ডিলাল। কে কখন কোথায় যায়, কী করে, সব তার জানা।

লোকটার স্পর্ধায় মাথার ভেতর আগুন ধরে যায় রামচরিতের। তিনি এ অঞ্চলের সব চাইতে বিখ্যাত, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ। সবচেয়ে পয়সাওলা এবং সবচেয়ে বড় জমিমালিকও তিনিই। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এ জাতীয় কথা বলার সাহস বা ধৃষ্টতা ষাট সত্তর মাইলের ভেতর কারো নেই। তাঁর চোয়াল প্রচণ্ড রাগে শক্ত হয়ে ওঠে।

ঠাণ্ডিলাল দাঁত মাজে না, নাহানার (স্নানের) ধার ধারে না। তার গা থেকে মুখ থেকে পচা বোটকা গন্ধ উঠে আসছে। নাকের ভেতর দিয়ে সেই বদবু গল গল ক'রে ঢুকে রামচরিতের রাগটাকে দশ গুণ চড়িয়ে দিতে থাকে।

ঠাণ্ডিলাল থামে নি, 'রামসীয়া মন্দিরে ত আমাদের ঢুকতে দেয় না। আপনাকে দর্শন ক'রে বহোত পুণ হল। আসলীর বদলে নকলী রামচন্দজী! পরণাম হুজৌর—' বলেই কোমর বাঁকিয়ে রাস্তায় মাথা ঠেকিয়েই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়।

লোকটা তাঁকে নকল রামচন্দজী বলে তামাসা করল কি? এই মুহূর্তে ঠাণ্ডিলালের আচরণ এবং কথাবার্তার ধাঁচ লক্ষ্য করলে সে আদৌ পাগল কিনা, এ সম্পর্কে সংশয় হতে পারে। হারামজাদকা ছৌয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাজার রকম শয়তানি। রামচরিত টের পান, তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত ধাঁ ধাঁ ক'রে দুরন্ত বেগে মাথায় উঠে আসছে। চোখ এখন টকটকে রক্তের ডেলা।

এই মুহূর্তে পহেলবানদের দিয়ে ঠাণ্ডিলালের চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারেন রামচরিত। কিন্তু তাতে লোকে সামনাসামনি কিছু বলতে সাহস না করলেও আড়ালে নিশ্চয়ই তাঁর গায়ে থুক দেবে। লোকনিন্দা তাঁর খুব অপছন্দ।

ঠাণ্ডিলাল আচমকা খ্যা খ্যা ক'রে হেসে ওঠে। এখন তাকে অদ্ভুত খ্যাপাটে দেখায়। হাসতে হাসতেই সে বলে, 'সুবে সুবে রামচন্দ্র দর্শন হো গিয়া। মর গিয়া রে, মর গিয়া—'

হুজুরের হুকুম না পাওয়ায় এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল পহেলবান দুটো। রামচরিতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে এবার তাদের মনে হয় কিছু একটা করা দরকার। তারা হঠাৎ হৈ হৈ করতে করতে লাঠি উঁচিয়ে ঠাণ্ডিলালের দিকে তাড়া ক'রে যায়। কিন্তু লোকটা শিয়ালের চাইতেও ধড়িবাজ। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছোকরাগুলোকে বলে, 'ভাগ্ রে ঝুনিয়া চুনমুনিয়া হুরবুলিয়া—পাহলবান হাড্ডি তোড় দেগা।' বলেই চোখের পলকে জারজের দলটাকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাজার মহল্লা থেকে উধাও হয়ে যায়।

পাগল হোক, খ্যাপা হোক, ভূচ্চরের ছৌয়া ঠাণ্ডিলাল প্রকাশ্য দিবালোকে অগুণতি মানুষ এবং পশুর সামনে তাঁকে প্রচণ্ড বেইজ্জত এবং অপদস্থ করেছে। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত রামচরিত আবার গিয়ে ফাটনে ওঠেন।

পুণ্যকর্মে আজ বার বার তাল কেটে যাচ্ছে। এরপর নিঃশব্দে এবং অন্যমনস্কভাবে বাকী পশুদের ভোজন করিয়ে কোঠিতে ফিরে আসেন রামচরিত। লখিনপুরার তাবত বেওয়ারিশ ষাঁড় কুকুর এবং গাধা অন্য সব দিনের মতো তাঁকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।



বাড়ির ভেতর এসে ফীটন থেকে নেমে সোজা দোতলায় চলে যান রামচরিত। তার আগেই দারোয়ান জানিয়ে দেয় সরগণা আদমীরা এখনও আসেন নি।

দ্বিতীয় দফা 'পুণ' সেরে আসার পর রোজকার মতো রামচরিতের আজও চোখে পড়ে সারা বাড়ি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। চার পাঁচটা নৌকরনী দিয়ে বাড়িটা ধোয়াচ্ছেন গোমতী। দিনে কম ক'রে বার তিনেক এত বড় কোঠিটা ধোয়ান। এটাও তাঁর একটা বাতিক।

স্বামীকে দেখে নৌকরনীদের কিছু জরুরি নির্দেশ দিয়ে তাঁর সঙ্গে শোবার ঘরে চলে আসেন গোমতী। রামচরিতের গায়ে আর এক দফা গঙ্গাজল ছিটানো হয়।

শুদ্ধির পর বিরজিয়াকে দিয়ে পুরি ভাজি ক্ষীর ইত্যাদি আনিয়ে দেন গোমতী। চার বেলা স্বামীকে সামনে দাঁড়িয়ে ভোজন করান তিনি। রাত্তিরে এক বিছানায় শোয়াটুকু বাদ দিলে তাঁর স্বামীসেবায় খুঁত নেই।

খেতে খেতে হঠাৎ গোমতীর পাশাপাশি রতিয়ার আশ্চর্য লোভনীয় শরীরটা চোখের সামনে ফুটে উঠল। কার্যকারণ নেই, তবু কেন যে বার বার 'ঘরকা লছমী'র পাশে একটা ওঁচা বেশ্যার মূরত ভেসে ওঠে, কে জানে। অথচ এই মুহূর্তে ঠাণ্ডিলালের কথাই মনে পড়া উচিত ছিল। কেননা তার ব্যাপারটাই অনেক বেশি টাটকা। রতিয়াকে তো

দেখেছেন সেই কোন ভোরে!

মনকে শান্ত এবং উত্তেজনাশূন্য করার জন্য দেওয়ালের হরপার্বতী কিংবা রাধাকৃষ্ণের ধ্যাবড়া ছবিগুলোর দিকে তাকান রামচরিত। মনে মনে বলেন, 'প্রভু শিউশঙ্কর, আমার মতি যেন কুপথে না যায়।'

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় একটা নৌকর দৌড়ে এসে খবর দেয়, লখিনপুরা এবং চারপাশের সম্মানিত বড়ে বড়ে আদমীরা এসে গেছেন।

একতলার বৈঠকখানায় তাঁদের বসাতে বলে রামচরিত দ্রুত খাওয়া চুকিয়ে নিচে নেমে যান।

বসবার ঘরটা প্রকাণ্ড। কম করে পাঁচ শ স্কোয়ার ফুট ত হবেই। এখানে পুরনো ধাঁচের ভারী ভারী অগুণতি সোফা যেমন রয়েছে তেমনি একধারে বিশাল গদিমোড়া ফরাসও চোখে পড়ে। আরাম করার জন্য সেখানে ডজন ডজন তাকিয়া।

পুরো মেঝেটা দামী কাশ্মীরী কার্পেটে মোড়া। দেয়ালে পূর্ব-পুরুষদের বিরাট বিরাট অয়েলপেন্টিং।

অতিথিরা মোট ছ'জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লখিনপুরা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রাজগৃহ তেওয়ারী, ডাক্তার জগৎনারায়ণ ঝা, ছ মাইল দূরের ছোট টাউন ভরতপুরার সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিষ্ণুকান্ত সহায়, দশ মাইল দূরের বড় গঞ্জ সুরথপুরার নামকরা বৈদ (কবিরাজ) যদুনন্দন দুবে, চার মাইল দূরের বড় গাঁ জানকীপুরের মাঝারি জমিমালিক চন্দ্রেশ্বর সিং এবং লখিনপুরার বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত মনপসন্দ মিশ্র।

এঁদের কেউ কেউ সোফায় বসেছেন। কেউ বা ফরাসে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছেন।

রামচরিত বৈঠকখানায় ঢুকতেই সবাই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ান। সসম্ভ্রমে বলেন, 'নমস্তে—'

'নমস্তে নমস্তে—' রামচরিতও হাতজোড় করেন, 'বসুন বসুন সকলে বসবার পর নিজে একটা সোফায় বসতে বসতে বলেন, 'আমা কী সৌভাগ, গরীবের কোঠিতে আপনাদের মতো বড়ে বড়ে আদমী পায়ের ধুলো পড়ল।'

সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠেন। বিনয়ে গলে যেতে যেতে জানা সৌভাগ্যটা আসলে তাঁদেরই। কেননা রামচরিতের মতো ধর্মাত্ম আদমীর দর্শন পাওয়া অশেষ 'পুণে'র ব্যাপার। তা ছাড়া চৌবেদে কোঠি ত এ অঞ্চলের একটা বড় তীরথ্ (তীর্থ)। সেখানে আস পারাটাও একটা পুণ্যকর্ম।

এতগুলো গণ্যমান্য লোকের চাটুকারিতায় খুশীই হন রামচরিত পরিতৃপ্ত তেলতেলে মুখে বলেন, 'কী যে বলেন আপনারা! আ ছোটে আদমী।' তারপর প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের খবর নিতে থাকে তাঁদের বাড়ির কে কেমন আছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন। অতিথিরা রামচরিতের পারিবারিক এবং শারীরিক ব্যাপারে গভীর আগ্রহে এ সব প্রশ্ন করেন যাতে মনে হয়, এগুলোর উত্তর পাওয়াটা তাঁদের মর বাঁচনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

এই সব প্রশ্নোত্তরের পালা চুকলে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারমা রাজগৃহ তেওয়ারী বলেন, 'এবার তা হলে আসল কথাটা শুরু ক যাক। আমরা যে জন্যে আপনার কাছে—'

হাত তুলে রাজগৃহকে থামিয়ে দেন রামচরিত। বলে 'ভাড়াহুড়োর কিছু নেই। সব শুনব। তার আগে থোড়ে মেহমানদারি করতে দিন। একটু চায়পানি খান—'

ঠিক এই সময় দুটো নৌকর এবং একটা নৌককরনী বড় ব নকশা-করা কাঠের ট্রে করে চাঁদির রেকাবীতে লাড্ডু নিমকিন প্যা গুলাবজামুন, চাঁদির গেলাসে জল এবং ফুল-লতা-পাতা আঁকা দা কাপে এলাচ-লবঙ্গ মেশানো খুসবুদার চা এনে অতিথিদের সাম ছোট ছোট নীচু টেবলে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

হাত জোড় করে রামচরিত বলেন, 'কিরপা করে মুহ্-মিঠা করে নিন।'

সবার জন্য লাড্ডু টাড্ডু এসেছে। রামচরিতের সামনের টেবলটাই শুধু ফাঁকা। মনপসন্দ মিশ্র বলেন, 'এ কি, আমরাই খাব নাকি? আপনি—'

'আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি। কিরপা করে আপনারা শুরু করুন।'

অগত্যা অতিথিরা লাড্ডু বা প্যাঁড়া তুলে চিবুতে থাকেন। রামচরিত বলেন, 'খেতে খেতে কথা হোক। এই সকালবেলা এত্ত বড়ে বড়ে আদমীর দর্শন কেন মিলল, এবার শোনা যাক—'

সবার প্রতিনিধি হিসেবে মনপসন্দ এভাবে আরম্ভ করেন, 'আমাদের হিন্দু ধরমের বহোৎ বিপদ চৌবেজী। ষাট সাল আগে এই মহান ধরম একবার ভারি বিপদে পড়েছিল। রামসিংহাসনজী তখন একে বাঁচিয়েছিলেন। লেকেন এবারের বিপদটা অনেকগুণ বেশি। তাই আপনার কাছে আসতে হল।'

রামচরিত বলেন, 'বিপদের কথা আগেই শুনেছি। লেকেন সেটা কী ধরনের?'

মনপসন্দ এবার যা বলেন তা এইরকম। সামনে যে চুনাও আসছে তাতে একটা মারাত্মক ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিধান মণ্ডলে এবং লোকসভায় এম. এল. এ বা এম. পী হবার জন্য যারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে তাদের শতকরা পঞ্চাশ জনই হয় অচ্ছুৎ বা মুসলমান। অগুণতি নামের একটা লম্বা তালিকা পকেট থেকে বার করে মনপসন্দ পড়ে যান। তারপর বলেন, 'দেখুন লখিনপুরার চারপাশে যে তিরিশ চল্লিশটা বিধানমণ্ডলের সীট রয়েছে তার জন্যে আড়াইশ অচ্ছুৎ আর একশ মুসলমান প্রার্থী দাঁড়াচ্ছে। লেকেন, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ এবং কায়াথ মোটে ছশো ষাট জন। পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর দিকে তাকান। দেখুন হরিজন আর মাইনোরিটি ভোট

পাবার জন্যে অচ্ছুৎ আর মুসলমানদের দাঁড় করাচ্ছে।'

গভীর আগ্রহে শুনে যাচ্ছিলেন রামচরিত। অনেকখানি ঝুঁকে বলেন, 'ঠিক, ঠিক বাত। এসব ত আগে খেয়াল করি নি।'

ডাক্তার জগৎনারায়ণ ঝা বলেন, 'আমাদের লখিনপুরার চারপাশেই শুধু না, সারা ইণ্ডিয়ার এই হল পিকচার। তার ফলটা কী হতে যাচ্ছে, ভাবতে পারেন চৌবেজী ?'

'কী ?' রামচরিত জগৎনারায়ণের দিকে তাকান।

'মাইনোরিটি আর অচ্ছুৎরা চুনাওতে জিতে অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেণ্টে গেলে গভর্নমেণ্ট, দেশ—সবকিছু ওদের হাতে চলে যাবে। ওরা এমন কিছু কানুন বানাতে পারে যাতে হিন্দু ধরম আপার-কাস্ট হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।' জগৎনারায়ণ বলে যান, হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হলে যেভাবেই হোক তা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে থাকা দরকার।

রামচরিত এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বোধ করছিলেন। গলার স্বরে জোর দিয়ে বলেন, 'জরুর।'

প্রিন্সিপ্যাল বিষ্ণুকান্ত সহায় বলেন, 'অচ্ছুৎ এবং মাইনোরিটিরা যদি বেশি করে অ্যাসেম্বলি আর পার্লামেণ্টে পীপলস রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়ে ঢোকে তা হল কী ধারণা হবে ?'

'কী ?'

'এদেশে ব্রাহ্মণ কায়াথ বা উচ্চর্ণের হিন্দু নেই। মহান হিন্দুধরমকে বিনাশ থেকে বাঁচাবার জন্যে এখনই একটা কিছু করা দরকার। দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

রামচরিত শুধোন, 'কী করতে চান আপনারা ?'

বৈদ যত্নন্দন দুবে বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লখিনপুরা সীটে দু'জন অচ্ছুৎ, একজন মুসলমান আর একজন খ্রীস্টান এবার চুনাওতে দাঁড়িয়েছে। একজন শুধু রাজপুত ক্ষত্রিয়। সে দুবলা ক্যাণ্ডিডেট। বেশি ভোট পাবে বলে মনে হয় না। সে থাক,

আমাদের জনপ্রতিনিধি একজন মাইনোরিটি কি অচ্ছুৎ হতে পারে না। তাই আমরা সবাই আর্জি নিয়ে এসেছি, আপনি এবারকার চুনাওতে দাঁড়ান।'

'আমি!' রামচরিতের চমক লাগে।

'হাঁ, আপনি।' মনপসন্দ বলেন, 'রামসিংহাসনজী একবার হিন্দু ধরমকে বাঁচিয়েছিলেন, আপনি এবার বাঁচান।'

উত্তেজনাটা কয়েক গুণ বেড়ে যায় রামচরিতের। হিন্দুধর্মকে এ অঞ্চলে এতকাল তিনি আগলে রেখেছেন। এই দায়িত্ব তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু চুনাওতে নেমেও যে হিন্দুধর্মের সুরক্ষা অন্য দিক থেকে করা যায়, এটা তিনি কখনও ভাবেন নি। অথচ মনপসন্দরা যা বলছেন তার প্রতিটি বর্ণ যে সত্যি তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু দ্বিধান্বিতভাবে রামচরিত বলেন, 'লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'আমি ত কোনোদিন পলিটিকস করি নি। লোকে আমাকে ভোট দেবে কেন?'

মনপসন্দরা সমস্বরে এবার যা জানান তা এই। রামচরিত এখানকার সব চাইতে বড় জমিমালিক। সব চাইতে বিখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও তিনিই। তা ছাড়া পুণ্যাত্মা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম। চতুর্বেদী বংশের মহিমান্বিত ব্যাকগ্রাউণ্ড তাঁর মূরতকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

এখনও ব্রাহ্মণকে মানুষ কিছুটা খাতিরদারি করে চলে। তা ছাড়া এ অঞ্চলের বহু ক্ষেতমজুরের জীবনের সর্বস্বত্ব তাঁর কাছে বিকিয়ে দেওয়া। তারা তাঁর জমি পুরুষানুক্রমে চষে আসছে। চারপাশের আবহাওয়া রামচরিতের পক্ষে বেজায় অনুকূল। তিনি চুনাওতে দাঁড়ালে অন্য প্রার্থীদের জামানত অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে।

যে উত্তেজনাটা রামচরিতের রক্তের মধ্যে সমানে কাজ করছিল, সেটা আরো বেড়ে যায়। চুনাওতে জিতলে তিনি এম. এল. এ হবেন,

তাঁর হাতে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা আসবে, এমন কি ভাগ্যের তেমন জোর থাকলে মন্ত্রী পর্যন্ত হতে পারেন। এসব ভাবনা তাঁর শরীরে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়ে দিতে থাকে।

আজকের দিনটা খুবই আশ্চর্যভাবে শুরু হয়েছে। ভোরে রামসীতা মন্দিরের সামনে এক জঘন্য আওরতের তীব্র মাদকতা-ভরা নিষিদ্ধ দেহ তাঁর মধ্যেকার নিভু-নিভু ঘুমন্ত উত্তেজনাকে উসকে দিয়েছিল। এখন চুনাও-এর ব্যাপারটা তাঁর কাছে আর এক প্রবল উত্তেজনা নিয়ে এসেছে। দুই উত্তেজনার ভেতর কার্যকারণ কোনো সম্পর্ক নেই, আলাদা আলাদা ধাতুতে সেগুলো তৈরি। তবু মনে হয়, এদের মধ্যে কোথায় যেন সূক্ষ্ম মিল রয়েছে।

এই চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর বয়সে রামচরিতের রক্তস্রোত যখন ঝিমিয়ে আসছে, তাঁর জীবন যখন শান্ত নিস্তরঙ্গ এবং নিতান্তই কতকগুলো অভ্যাসের ছকে বাঁধা, সেই সময় তাঁর নিস্তেজ শিথিল প্রৌঢ় স্নায়ুগুলো আচমকা টান টান হয়ে যায়।

রামচরিত বলেন, 'আপনারা যা বলছেন তা হয়ত ঠিক। চুনাওতে দাঁড়ালে কিছু ভোট জরুর পাব। রামসীতা আর শিউশঙ্করজীর কিরপা থাকলে জিতেও যেতে পারি। লেকেন --'

রামচরিতের এই 'লেকেন'-এর অর্থ বুঝতে না পেরে বিষ্ণুকান্তদের কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়। মনপসন্দ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'লেকেন কী?'

'চুনাওতে নামলে অনেক খরচ। অত পয়সা কে যোগাবে?'

যিনি হাজার বিঘা উৎকৃষ্ট জমির মালিক, যাঁর গণ্ডা গণ্ডা গুদাম ধান-গেঁহু-যবে বোঝাই, যাঁর সিন্দুকভর্তি অঢেল টাকা, অজস্র হীরা-মোতি এবং সোনাদানা, সেই মানুষ যে বিধানমণ্ডলীর চুনাও বাবদে খরচের কথাটা তুলবেন, এটা আগে কারো মাথায় আসে নি। চুনাও-এর কারণে তুচ্ছ বিশ পঞ্চাশ হাজার কি লাখ-খানেক টাকা বেরিয়ে গেলে রামচরিতের টের পাওয়ার কথা নয়। তবু তিনি খরচের কথাটা

তুলেছেন।

তাই ত, টাকাটা যোগাড় হবে কোত্থেকে? অনেক পরামর্শ করেও কোনো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

শেষপর্যন্ত রামচরিতই একটা উপায় খুঁজে বার করেন। বলেন, 'আপনারা সবাই জানেন, রামসীতা মন্দিরে হর মাহিনা বড় বড় শহর থেকে ডোনেসান আসে। ব্যাঙ্কে রামসীতাজীর নামে কিছু টাকা জমেছে।'

সবাই মাথা নেড়ে বলেন, এ খবর তাঁদের জানা। কেননা, তাঁরা প্রত্যেকেই রামসীতা মন্দিরের পরিচালন সমিতি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য।

'ঐ টাকা থেকে চুনাও-এর জন্যে কিছু খরচ করলে কেমন হয়? ওটা ভগোয়ানের টাকা, মতলব পাবলিক মানি। আপনারা সবাই মন্দিরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। তাই আপনাদের মত জানতে চাইছি।'

মন্দিরের টাকা এভাবে নির্বাচনের কারণে খরচ করা যায় কিনা, তাই নিয়ে মনপসন্দরা রীতিমত দ্বিধায় পড়েন। হাজার হোক রামসীতার নামে গচ্ছিত টাকা। ঈশ্বরের অর্থ এভাবে নয়ছয় করলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট নয়।

ওঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে রামচরিত বলেন, 'একটা কথা ভাল করে ভেবে দেখুন। কলকাত্তা পাটনা দিল্লী বুম্বাই থেকে ঐ সব টাকা আসছে কীসের জন্যে?' প্রশ্নটা করে নিজেই তার উত্তর দেন, 'হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্যেই ত। আমাদের মহান ধর্ম যখন বিপদে পড়বে তখন ঐ টাকা থেকে খরচ করা হবে।'

'হাঁ হাঁ, জরুর—' মনপসন্দরা সবাই এ বিষয়ে একমত হয়ে যান।

'আপনারাই তো খানিক আগে বলছিলেন, হিন্দুধর্মের সামনে এখন ঘোর দুর্দিন। তাকে বাঁচাতে হলে আমার চুনাওতে নামা দরকার।'

'হাঁ হাঁ—'

'আর এই চুনাওর জন্যে খরচ করার মতলব (মানে) হল হিন্দু-ধর্মের সুরক্ষার জন্যে খরচ করা। আপনাদের আপত্তি নেই ত ?'

রামচরিতের যুক্তি বা লজিকের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক পাওয়া যায় না। মনপসন্দরা সমস্বরে জানান, তাঁদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। মহান হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে হলে এই খরচটা একান্ত দরকার। রামসীতার টাকার এমন সদ্‌গতি আর কোনোভাবেই হওয়া সম্ভব না।

এরপর চুনাও সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হতে থাকে।

নির্বাচন ত সামান্য বস্তু না ; সেটা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের মতো এলাহী ব্যাপার।

চুনাওতে নামতে হলে গভর্নমেণ্টের কাছে নাম এবং প্রতীক দাখিল করতে হবে ; পোস্টার ছাপতে হবে ; দেয়ালে লেখার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য গাদা গাদা নির্বাচন-কর্মী চাই। তারা মীটিং-মিছিলের আয়োজন করবে, দিন রাত জীপে কি টাঙ্গায় ঘুরে ঘুরে 'ভোট দো, ভোট দো' করে লখিনপুরা টাউন সরগরম করে রাখবে ; বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটদাতাদের বোঝাবে রামচরিতের মতো প্রার্থী ভূ-ভারতে আর কখনও দেখা যায় নি ; তাঁকে ভোট দেওয়া মানেই এই কলিযুগে রামরাজের প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোনো একজনের পক্ষে এত দিক সামলানো অসম্ভব। কাজেই মনপসন্দরা মহান দায়িত্বগুলো ভাগাভাগি করে নেন। রাজগৃহ নির্বাচন-কর্মী যোগাড় করবেন। পোস্টার ছাপা, দেয়ালে লেখানো—অর্থাৎ প্রচারের কাজগুলো দেখবেন জগৎনারায়ণ। চন্দ্রেশ্বর সিং মীটিং-মিছিলের ভার নেবেন। চুনাওর কারণে রামচরিতের নাম এবং প্রতীক জমা দেওয়া থেকে শুরু করে থানা-পুলিশ-ডি. এমের সঙ্গে ত বটেই, সরকারী প্রশাসনের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন বিষ্ণুকান্ত। এই সব জরুরী কাজ যাতে মসৃণ

ভাবে হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন যদুনন্দন এবং মনপসন্দ।

ভালো টিমওয়ার্ক ছাড়া চুনাও জেতা যায় না। এক বিভাগের সঙ্গে আর এক বিভাগের কাজের যাতে মিল থাকে, মনপসন্দরা সেটা দেখবেন। কোথাও ভুলচুক হলে তৎক্ষণাৎ শুধরে দেবেন। মোট কথা নির্বাচনী অর্কেস্ট্রায় কোথাও যাতে তাল না কাটে, তার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হল।

সবাই কথা দিলেন, নিজের নিজের দায়িত্ব গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। কেননা এটা শুধু সামান্য নির্বাচন নয়, এর সঙ্গে হিন্দুধর্মের সুরক্ষার প্রশ্ন জড়িত। এই মহান ধর্মকে টিকে থাকতে হলে রামচরিতের জেতা একান্ত জরুরী। এবং তাঁকে জেতানো মনপসন্দদের পবিত্র দায়।

বিষ্ণুকান্ত বলেন, 'ইলেকসানের বেশি দেরি নেই। রামচরিতজীর নাম-টাম এবার জমা দিতে হয়।'

যদুনন্দন বলেন, 'হাঁ, শুভকাজের শুরুটা তাড়াতাড়িই করা হোক, শুভস্য শীঘ্রং।'

কিন্তু সংস্কৃতের নাম-করা পণ্ডিত মনপসন্দ মিশ্রর রক্তে বহু প্রাচীন সংস্কার মিশে আছে। হুট করে কিছু করে ফেলার পক্ষপাতী তিনি নন। বললেন, 'পবিত্র কাজ এত তাড়াহুড়ো করে আরম্ভ করা ঠিক নয়। দিন তিথি দেখে, শুভ ক্ষণ ঠিক করে নাম জমা দিতে হবে।'

রামচরিতের মধ্যেও গণ্ডা গণ্ডা সংস্কার রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সায় দেন, 'জরুর। হিন্দু ধরমের সুরক্ষার মতো বড় কাজ। শুভ তিথি না দেখে কিছু করা উচিত না। এখুনি পঞ্জিকা আনাচ্ছি—'

স্বয়ং রামচরিত যখন ভালো দিনক্ষণের ওপর জোর দিচ্ছেন তখন সবাই এ বিষয়ে একমত হয়ে যান। সমস্বরে বলেন, 'হাঁ হাঁ, পঞ্জিকা আনান। এখনই দিন আর সময় পাকা করে নেওয়া যাক।'

রামচরিতের হুকুমে নৌকর পঞ্জিকা নিয়ে আসে। ধর্মশাস্ত্র এবং দেবভাষা জানার গৌরবে পঞ্জিকা দেখার সম্মানটা পণ্ডিত মনপসন্দ

মিশ্রকেই দেওয়া হয়। তা ছাড়া বয়সের অধিকারেও এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। আজ এখানে হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্য যাঁরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জমা হয়েছেন, বয়সে তিনি সবার বড়।

নিকেলের গোল চশমা নাকের ডগায় ঝুলিয়ে মনপসন্দ পঞ্জিকার ভেতর মুখ গুঁজে দেন। পাতা উল্টে উল্টে আধ ঘণ্টার পরিশ্রমে একটা নিখুঁত দিনও বার করে ফেলেন। তারপর রামচরিতের উদ্দেশে বলেন, 'চৌবেজি, আপনার জন্মপত্রি করা আছে?'

'জরুর। বনারস হৃষীকেশ দ্বারকা আর কলকাত্তার চার বড় পণ্ডিতকে দিয়ে পিতাজী আমার চারটে জন্মপত্রি বানিয়েছিলেন। চারটেই আনিয়ে দিচ্ছি।'

একটু পরেই চারখানা দশ ফুট করে লম্বা কোষ্ঠি এসে যায়। অনেকক্ষণ সেগুলোর ভেতর ডুবে থাকেন মনপসন্দ। পঞ্জিকার নিষ্কলঙ্ক দিনটার সঙ্গে রামচরিতের জন্মক্ষণের গ্রহতারা মিলিয়ে কী সব দেখেন। তারপর পরিতৃপ্ত হেসে জানান, এমন সর্বসুলক্ষণ দিন আর হয় না; রামচরিতের জয় অনিবার্য। মহান হিন্দুধর্ম চরম বিপদ থেকে রক্ষা পাবেই।

সবাই এতক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে ছিলেন। ফুসফুসের আবদ্ধ বাতাস বার করে দিয়ে তাঁরা হাসেন—আরাম এবং স্বস্তির হাসি।

স্থির হয় চারদিন পর যে সোমবারটা পড়ছে সেদিন দুপুর বারোটা সাতান্ন মিনিটে বিষ্ণুকান্ত সহায় রামচরিতের নাম এবং প্রতীক জমা দেবেন।



মনপসন্দরা চলে যাবার পর আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে ফের দোতলায় উঠে আসেন রামচরিত। এ অঞ্চলের গণ্যমান্য মানুষেরা হিন্দুধর্মের মহিমা সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছেন। তাঁর ওপর কী অগাধ আস্থা এবং বিশ্বাস এঁদের। রামসিংহাসনের পর এমন সম্মান লখিনপুরায় আর কেউ কখনও পায় নি।

তা ছাড়া চোখের সামনে নির্বাচনের চিত্র যেন সিনেমার মতো দেখতে পাচ্ছেন রামচরিত। আর ক'দিনের মধ্যেই লখিনপুরা এবং চারপাশের গ্রামগঞ্জের দেয়াল তাঁর নাম এবং প্রতীকের ছবিতে ছেয়ে যাবে। চুনাও-কর্মীরা দিনরাত 'রামচরিতজীকে ভোট দিন, ভোট দিন' করে আকাশ চৌচির করে ফেলবে। সেই সব শব্দ যেন এখনই শুনতে পাচ্ছেন রামচরিত।

যে উত্তেজনাটা তাঁর রক্তের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ আগেও শির শির করে বয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেটা দশগুণ বেড়ে গেছে।

এখন রামচরিতের দোতলায় ওঠার উদ্দেশ্য, গোমতীকে চুনাওর খবরটা জানানো। মনপসন্দরা কেন এসেছিলেন তা জানার জন্য গোমতী হয়ত উদগ্রীব হয়ে আছেন।

বাড়ি সাফাইয়ের কাজ এখনও পুরোপুরি সমাধা হয় নি, তবে শেষ হয়ে এসেছে। নৌকরনীরা বালতি বালতি জল ঢেলে ধোয়ার কাজটা চুকিয়ে ফেলেছে ; এখন চলছে শুকনো কাপড় দিয়ে মোছা। গোমতী

একধারে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে তদারক করছেন।

রামচরিতকে দেখে কাছে এগিয়ে আসেন গোমতী। জিজ্ঞেস করেন, 'ওঁরা এসেছিলেন কেন ? কী কথা হল ?' তাঁর চোখে মুখে কিছুটা ঔৎসুক্য ফুটল।

প্রচণ্ড উৎসাহে সব জানালেন রামচরিত।

গোমতী শুধোন, 'তুমি তা হলে চুনাওতে নামছ !'

'হাঁ।'

'জিততে পারবে ?'

'জরুর। এখানকার লোকেরা আমাকে ভোট না দিয়ে যাবে কোথায় ? এম. এল. এ আমি হবই।'

মজার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে গোমতী বললেন, 'নমস্তে এম. এল. এ সাহাব—'

রামচরিত হেসে ফেলেন, 'আমি এখনও এম. এল. এ হই নি।'

'বললে যে হবে। তাই আগে থেকে খাতিরদারি করছি।' গোমতীও হাসতে থাকেন।

কী ভেবে রামচরিত এবার বলেন, 'শিউশঙ্করজী আর রামসীতাজীর কিরপা হলে মিনিস্টারও হয়ে যেতে পারি। তখন মিনিস্টারের বিবি বলে দুনিয়ার লোক তোমাকেও খাতিরদারি করে চলবে।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে রতিয়ার তীব্র মোহময় শরীরটা ফুটে ওঠে। যতবার গোমতীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে ততবারই অনিবার্য কোনো সংকেতের মতো রতিয়াকে মনে পড়ে যাচ্ছে। তাঁর মতো শুদ্ধ চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে একটা নোংরা আওরতকে মনে করে রাখা সাঙ্ঘাতিক গর্হিত কাজ কিন্তু কিছুতেই তাকে ভোলা যাচ্ছে না। ভাবনার স্তর ঠেলে ঠেলে একটু সুযোগ পেলেই সে বেরিয়ে আসছে।

কোনো বিষয়েই গোমতীর আগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। রামচরিতের এম. এল. এ হওয়া সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল মিটে গেছে। বললেন, 'আমি আর দাঁড়াতে পারব না, কোঠি সাফাই এখনও বাকি রয়েছে—'

বলতে বলতে টানা বারান্দার শেষ মাথায় চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ কবুতরী, এ ছোকরি, ভালো করে ঘষে ঘষে মোছ—' বলতে বলতে বিরাট ভারী শরীর টানতে টানতে ভীষণ ব্যস্তভাবে এগিয়ে যান। সারা বাড়ি আয়নার মতো ঝকঝকে না হওয়া পর্যন্ত নৌকরনীদের নিস্তার নেই।

অগত্যা আবার নিচে নেমে আসেন রামচরিত। এখনও তাঁর কিছু কাজ বাকি।

রোজ সকালে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর গাধা এবং ষাঁড়দের ভোজন করিয়ে আসার পর রামচরিত তাঁর পোষা প্রাণীগুলোকে কিছুক্ষণ আদর করেন, নিজের হাতে তাদের খানিকটা দানাপানি খাওয়ান। কিন্তু আজ মনপসন্দরা দল বেঁধে এসে পড়ায় ওদের কাছে যাবার সময় পাওয়া যায় নি।

কিন্তু তীব্র মাদকতায় ভরা এক নারীদেহ এবং চুনাওতে নামার সিদ্ধান্ত যত উত্তেজনাই নিয়ে আসুক, কর্তব্য ভোলেন না রামচরিত। পোষা পশুপাখিদের যত্ন করা তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যাস। কোনো কারণেই সেই অভ্যাস বা নিয়ম তিনি ভাঙতে চান না।

নিচে নেমে প্রথমে ডানদিকের শেডগুলোর তলায় চলে আসেন রামচরিত। ওগুলোর তলায় রয়েছে দশ বারোটা ঘোড়া। এই জীবগুলো তাঁর ফীটন এবং টাঙ্গা টানে।

রামচরিতকে দেখে সামনের দু পা তুলে ঘোড়াগুলো খুশিতে চিঁ হি চিঁ হি ডাকতে থাকে। রামচরিত গভীর স্নেহে তাদের গলায় পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'হারে চুন্নুয়া মুন্নুয়া বুন্নুয়া, আগে আসতে পারি নি বলে রাগ করিস না। দেখেছিস তো কত বড়ে বড়ে আদমী এসেছিল—'

ঘোড়াগুলো আবার ডাক ছাড়ে, 'চিঁহিহি—চিঁহিহি—' চুন্নুয়া মুন্নুয়া বুন্নুয়া তাদের আদরের নাম। শুধু তাদেরই নয়, এই নামেই রামচরিত বাড়ির যাবতীয় পোষা জীবজন্তু যেমন গরু মোষ এবং

হাতীদেরও ডেকে থাকেন।

একটা নৌকর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। রামচরিত বলেন, 'চানা নিয়ে আয়।'

নৌকর বলে, 'ওদের দানাপানি খাইয়েছি হুজুর—'

'ঠিক হ্যায়। তবু নিয়ে আয়।'

নিজের হাতে এদের কিছু খাওয়াতে না পারলে রামচরিতের ভালো লাগে না। নৌকর দৌড়ে থলে ভর্তি শুকনো ছোলা নিয়ে আসে। রামচরিত মুঠো মুঠো ছোলা তুলে ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে চলে যান বাঁ দিকের টানা শেডের তলায়। ওখানকার গরু এবং মোষেদের আদর ক'রে এবং নিজের হাতে খাইয়ে এবার বাড়ির পেছন দিকে যেখানে উঁচু উঁচু টিনেব চালার তলায় বারোটা হাতী রয়েছে সেখানে চলে আসেন।

হাতীরা বিরাট বিরাট কান নেড়ে, শুঁড় তুলে ঘোড়া বা গরু মোষগুলোর মতো গম্ভীর গলায় ডাকতে থাকে। এই হাতীগুলোকে 'ফান্দি'দের (ফাঁদ পেতে যারা হাতী ধরে) দিয়ে আসাম থেকে ধরিয়ে এনেছেন রামচরিত। ফী বছরই দুটো-একটা ক'রে হাতীর বাচ্চা ধরিয়ে আনেন। শুধু বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার উদ্দেশ্যে নয়, ওগুলো বড় হলে চড়া দামে কিষণগঞ্জ হরিহরছত্র কিংবা সীতামারহির মেলায় বেচে দেন। তাতে প্রচুর টাকা আসে।

লখিনপুরায় রামসীতা মন্দির এবং রেণ্ডিটুলি প্রতিষ্ঠার মতো হাতীর এই পারিবারিক ব্যবসাটিও চালু করেছিলেন রামচরিতের ঠাকুরদা রামসিংহাসন। তিন পুরুষ ধরে সেটা চলছে।

ছোটবেলা থেকে হাতী দেখে দেখে তাদের লক্ষণ বুঝতে পারেন রামচরিত। তাঁর যে বারোটা হাতী রয়েছে তার মধ্যে পাঁচটা ঝাড়ুদুম, চারটে গ্যাঁড়াখাল, বাকি তিনটে পঞ্ছীদুম। ঝাড়ুদুম হল সেই জাতের হাতী যাদের লম্বা ল্যাজ গোড়ালির নিচে পর্যন্ত নেমে গেছে। 'গ্যাঁড়াখাল' দের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মতো কর্কশ এবং পুরু।

পঞ্চাহমদের ল্যাজ হয় ছোট।

বামচরিতের বারোটা হাতীই বেশ সুলক্ষণ। ওদের পাঁচটা মাদী, বাকি সাতটা পুরুষ। মাদীগুলো সবই নলদাঁতা ; তাদের দাঁত লম্বা এবং সরু। পুরুষগুলো পালংদাঁতা ; ওদের দাঁতগুলো বেশ মোটা তবে আগার দিকটা ওলটানো।

মাহুতরা শেডের তলাতেই ছিল। রামচরিতকে দেখে ক'টা বাঁশের ঝোড়া নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। ঝোড়াগুলো শশা কলা এবং ছোলাতে বোঝাই। রামচরিত নিজের হাতে হাতীদের খাওয়ান ; তাই এসব খাদ্য মজুদ করাই থাকে।

রামচরিত হাতীদের মুখের কাছে শশা বা কলা ধরে বলেন, 'খা রে চুন্নু মুন্নু বুন্নু—'

খাওয়াতে খাওয়াতে মাহুতদের সঙ্গেও কথা বলতে থাকেন রামচরিত, 'কি আনোয়ার, কিষণগঞ্জের মেলা তো এসে গেল।'

আনোয়ার রামসিংহাসনের আমল থেকে এ বাড়িতে আছে। হাতীদের যাবতীয় দায়িত্ব তার। জীবজগতের এই বিশেষ প্রাণীটি সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সাদি করে নি ; দুনিয়ায় তার কেউ আছে বলে শোনা যায় না। হাতী নিয়েই তার ঘর-সংসার। এই প্রাণীটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

আনোয়ার রামচরিতের জন্য 'ফান্দি' যোগাড় ক'রে হাতী ধরিয়ে আনে ; তাদের 'পালপোষ' ক'রে বড় ক'রে তোলে। একা তো তার পক্ষে এতগুলো হাতীর পরিচর্যা সম্ভব না। তাই নতুন নতুন মাহুত জোটাতে হয় ; সেই কাজটাও আনোয়ারই ক'রে থাকে। বাকি যে তের চোদ্দজন মাহুত রয়েছে তারা তাকে যথেষ্ট খাতিরদারি ক'রে চলে।

হাতীদের 'দেখভালই' শুধু না, মেলায় মেলায় তাদের বিক্রির ব্যবস্থা ও সে-ই করে।

আনোয়ার বলে, 'হাঁ ছোটে হুজৌর, কিষুণগঞ্জের মেলের আর

দেরি নেই। বীচমে সিরিফ দো মাহিনা।'

'দালালরা আসছে ?'

যারা হাতী বেচে, মেলা বসবার অনেক আগেই দালালরা তাদের কাছে হানা দিয়ে দরদস্তুর ঠিক ক'রে রাখতে চায়।

আনোয়ার বলে, 'নহী হুজৌর—'

রামচরিত একটু কী ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'এবার কিরকম দাম পাওয়া যাবে ?'

'ভালো দাম। আমাদের সব হাঁথীই খুবসুরত আর খুশনসীব। এমন হাঁথী পাইসা আনবে না তো কোন হাঁথী আনবে ?'

'সব হাঁথীই কি এবার বেচে দিতে চাও ?'

'হুজৌরকা যো মর্জি।'

'তুমি কী বলো ?'

হাতীর ব্যাপারে আনোয়ারের কথাই হল শেষ কথা। তার পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন রামচরিত। এতে তিনি যথেষ্ট লাভবানই হয়ে থাকেন।

আনোয়ার বলে, 'কিষুণগঞ্জের মেল ছোটে মেল। দো-তিনগো হাঁথী ওখানে বেচে বাকীগুলো সীতামারহি আর হরিহরছত্রের মেলের জন্যে রেখে দিলে ভালো হয়। বড়ে মেলামে জ্যাদা পাইসা মিলেগা। আমীর আদমীলোগ উধর আতে হ্যায়।' অর্থাৎ কিষণগঞ্জের মতো ছোট মেলায় তেমন পয়সাওলা লোক কমই আসে। হরিহরছত্রের বিশাল মেলায় আসে দেশবিদেশের বড় বড় খদ্দেররা, আসে নানা সার্কাস কোম্পানির মালিক আর চিড়িয়াখানার কর্তারা। ভালো সর্বসুলক্ষণ হাতী পেলে তারা পয়সার পরোয়া করে না।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রামচরিত, আনোয়ার সঠিক পরামর্শই দিয়েছে। বলেন, 'ঠিক হ্যায়।' হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ফের বলেন, 'আচ্ছা আনোয়ার, এবার তো আসামের 'ফান্দি'রা এখনও এল না।'

'খবর দিয়েছি ; দো-চার রোজের মধ্যে এসে যাবে।'

'আমাদের সবগুলো হাঁথীই তো বড় হয়ে গেছে। ওরা অন্যের হাতে চলে যাবে। এখন বেশি ক'রে হাঁথীর বাচ্চা চাই; কমসে কম দশগো। ওদের 'পালপোষ' ক'রে বড় করতেও তো সময় লাগবে।'

'দশগো হাঁথীর বাচ্চারই ব্যওস্থা হয়ে যাবে ছোটে হুজৌর।'

হাতীদের খাওয়াতে খাওয়াতে সূর্য পশ্চিম আকাশের ঢালে নেমে যায়।

অন্যদিন সূর্য মাথার ওপর আসার আগেই তিন মাইল দূরে লাজপতিয়া গাঁয়ে তাঁর বিরাট খামারে একবার ঘুরে আসেন রামচরিত। যদিও খামারের কাজ তদারক করার জন্য অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং অনুগত হরকিষুণ মিশির রয়েছে, তবু পৃথিবীর আহ্নিক গতির মতো রোজ খামারে যাওয়াটা রামচরিতের কাছে দীর্ঘকালের নিয়ম এবং অভ্যাস।

কিন্তু এত বেলায় আজ আর খামারে যেতে ইচ্ছা করল না। 'আবার কাল আসব—' হাতীদের এ জাতীয় আশ্বাস দিয়ে বাড়িতে চলে আসেন রামচরিত; সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় উঠতে থাকেন।



ক'টা দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে বিষ্ণুকান্ত পাটনায় গিয়ে নির্বাচনের জন্য রামচরিতের নাম এবং তাঁর নির্বাচনী প্রতীক জমা দিয়ে এসেছেন। পাটনারই এক প্রেসে রামচরিত এবং তাঁর প্রতীক জাহাজের ছবি দিয়ে তিন ফুট বাই আড়াই ফুট মাপের পোস্টার ছাপতে দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার। প্রচুর নির্বাচন-কর্মী যোগাড় করেছেন রাজগৃহ মিশ্র। তাদের জন্য রামচরিতের বাড়ির পেছনে যে হাতীর শেড রয়েছে তার উল্টোদিকে তেরপলের সামিয়ানা খাটিয়ে 'ক্যাম্প' বসানো হয়েছে। এদের 'মুভমেন্টে'র জন্য দুটো জীপ ভাড়া করা হয়েছে ; তা ছাড়া রামচরিত নিজের চারটে টাঙ্গাও দিয়েছেন। দু দু'জন মৈথিলী রসুইকরকে রাখা হয়েছে ; চুনাও-কর্মীদের জন্য তারা পুরী-কচৌরি-নিমকিন-বুন্দিয়া থেকে শুরু ক'রে উৎকৃষ্ট 'ভাতকা ভোজনে'র ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া যখন যা তারা খেতে চাইবে তৎক্ষণাৎ তা বানিয়ে দিতে হবে। নির্বাচনের তারিখ পর্যন্ত চুনাও-কর্মীদের তোয়াজে রাখা দরকার।

রাজসূয় যজ্ঞের মতো যে এলাহী কাণ্ড ফাঁদা হয়েছে তাতে অনেক টাকা দরকার। আপাতত রামসীতা মন্দিরের নামে ব্যাঙ্কে যে বিরাট অঙ্কের ডিপোজিট রয়েছে তা থেকে চল্লিশ হাজার তুলেছেন রামচরিত।

লখিনপুরা নির্বাচন-কেন্দ্রে রামচরিতকে নিয়ে মোট ছ'জন প্রার্থী। বাকি পাঁচ হল যোশেফ গিরধর যাদব, শেখ নিজামুদ্দিন, সুখদেও

প্রসাদ, ধরতীলাল আর রাজপুত ক্ষত্রিয় ত্রিভুবন সিং। সুখদেও আর ধরতীলাল হরিজন। একজন দোসাদ, একজন ধাঙড়। জাত-পাতের বিচারে অচ্ছুৎ।

এদের মধ্যে ধরতীলাল এবং সুখদেওপ্রসাদ ছাড়া বাকি তিনজন দুর্বল ক্যাণ্ডিডেট।

ধরতীলাল আর সুখদেও অচ্ছুৎ হলেও লখিনপুরার মানুষজন তাদের মোটামুটি পছন্দ করে। উঁচু জাতের বামহন কায়াথরা যদিও তাদের ছায়া মাড়ায় না তবু মনে মনে সমীহ করে। তার কারণও আছে।

দু'জনেরই বয়স কম; কেউ তিরিশের বেশি হবে না। দু'জনেই ম্যাট্রিক পাশ। ওরা ছাড়া লখিনপুরার বিশ পঁচিশ মাইলের ভেতর আর কোনো অচ্ছুৎ ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি। সুখদেও এক বড় ঠিকাদারের কাছে মজুর খাটাবার কাজ করে; ধরতীলাল লখিনপুরা মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়দের ইনচার্জ। সৎ তেজী এবং পরোপকারী হিসেবে সারা লখিনপুরা জুড়ে তাদের যথেষ্ট সুনাম। কেউ বিপদে পড়ে ডাকলে তক্ষুনি তারা ছুটে যায়। বিশেষ ক'রে অচ্ছুৎটোলা থেকে ডাক এলে তো কথাই নেই।

দু'জনের বদলে একজন নামলে চোখ বুজে প্রচুর ভোট পেত। এমন কি জিতেও যেতে পারত। দু'জনেই ভালো প্রার্থী হওয়ায় ভোট ভাগাভাগি হয়ে তৃতীয় ক্যাণ্ডিডেটের বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ধরতীলাল এবং সুখদেও দুই অচ্ছুৎ নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি না ক'রে একজন চুনাওতে না নামলেই তো পারত। কিন্তু এখানে রয়েছে দোসাদ এবং ধাঙড়দের আবহমান-কালের রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এরা প্রার্থী দিলে ওরাও দেবেই। এটা ওদের নিজের জাতের মান ইজ্জতের সওয়াল।

বাকি তিন প্রার্থীর কারোই কোনো আশা নেই। বেশ কিছু খ্রীস্টান এবং মুসলমান আছে লখিনপুরায়। যোশেফ গিরধর যাদব বা

শেখ নিজামুদ্দিনের এমন সুনাম নেই যাতে ভালো ভোট পায়। খ্রীস্টান আর মুসলিম ভোটও তারা ক'টা পাবে সে সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছু বলা মুশকিল।

সবচেয়ে 'কমজোর' প্রার্থী হল রাজপুত ক্ষত্রিয় ত্রিভুবন সিং। সে বিখ্যাত মাতাল এবং বদমাস। নিজের বাড়ির ক'জন ছাড়া আর কেউ যে তার দিকে ফিরেও তাকাবে না সেটা লখিনপুরার একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও বলে দিতে পারে। তাকে হিসেবের বাইরে রাখা যায়।

শেষ পর্যন্ত চুনাওর চেহারাটা কী দাঁড়াত, বলা যায় না। রামচরিত নির্বাচনে নামার পর লখিনপুরায় প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা অকারণে নয়।

ভারত স্বাধীন হবার পরও বেশ কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন রাম-সিংহাসন। অন্তত দুটো সাধারণ নির্বাচন নিজের চোখে দেখে গেছেন। তাঁর ছেলে রামশরণ এই তো সেদিন মারা গেলেন। তিনি অগুনতি জেনারেল এবং বাই-ইলেকসান দেখেছেন। কিন্তু রাজনীতি বা নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁদের এতটুকু আগ্রহ ছিল না। তাঁরা চুনাওতে নামলে যে জিতে যেতেন, এ একেবারে অবধারিত।

লখিনপুরার সব চাইতে বিখ্যাত, সব চাইতে সম্মানিত ক্যামিলি থেকে দেশ স্বাধীন হবার তিরিশ বছর বাদে একজন নির্বাচনে দাঁড়ালেন। কত ঐরু-গৈরু-হৈরু-ভৈরু এতকাল এম. এল. এ হয়েছে, এম. পী হয়েছে, মিনিস্টার হয়েছে, কিন্তু চৌবেদের সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। তবু ভালো, এতদিনে তাঁদের হুঁশ হয়েছে। ফলে রামচরিতকে নিয়ে সারাক্ষণই লখিনপুরা সরগরম হয়ে থাকে। প্রায় সবারই ধারণা, একবার 'এম্লে' হতে পারলে জরুর রামচরিত 'মিনিস্টার' হবেন। তিরিশ বছরে এ দিকের কেউ মিনিস্টার হয় নি। রামচরিত মন্ত্রী হলে লখিনপুরার মর্যাদা বহু গুণ বেড়ে যাবে। প্রবল উত্তেজনায় এই ছোট্ট শহর থির থির কাঁপতে থাকে; তার হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি বেড়ে যায়।

চুনাওর ব্যাপারে আজকাল প্রায় রোজই রামচরিতের বাড়িতে আলোচনার আসর বসে।

নির্বাচনও তো এক ধরনের যুদ্ধই ; তার জন্য আগে থেকে রণকৌশল ঠিক ক'রে নেওয়া দরকার।

বিকেল পর্যন্ত ইহকাল এবং পরকালের সুখের জন্য নানারকম কাজকর্ম থাকে রামচরিতের। এই সময়টা তাঁকে পাওয়া মুশকিল। কাজেই সন্ধে হতে না হতেই মনপসন্দ মিশ্ররা একে একে চৌবেদের কোঠিতে চলে আসেন।

চুনাও-কর্মী যোগাড় হয়ে গেছে, নির্বাচনে নামার ব্যাপারে সরকারী অনুমোদনও পেয়ে গেছেন রামচরিত ; তাঁর প্রতীকও মেনে নেওয়া হয়েছে। সব কাজই মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার জগৎনারায়ণ ঝা'য়ের ইচ্ছা, এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে রামচরিত নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়ুন।

বৈদ্য যদুনন্দন দুবে কিছুটা ঢিলেঢালা ধরনের মানুষ। বলেন, 'এত তাড়াহুড়োর কি আছে ? চুনাওর এখনও অনেক দেরি। লগভগ আড়াই মাস তো বটেই। তা ছাড়া—'

জগৎনারায়ণ যদুনন্দনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'তা ছাড়া কী ?'

'অন্যেরা তো এখনও মাঠে নামে নি।'

'আমরা তো সেটাই কাজে লাগাতে চাই। আগে নেমে রাম-চরিতজীর জন্যে ক্ষেত্তি তৈরি ক'রে ফেলব। যার 'ক্যামপেন' আগে শুরু হবে, লোকের নজর বেশি ক'রে তার দিকেই পড়বে।'

আসলে জগৎনারায়ণ খুবই চটপটে এবং ব্যস্তবাগীশ। কোনো দায়িত্ব নিলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। যতক্ষণ না সেটা শুরু হচ্ছে, তাঁর রক্তচাপ প্রচণ্ড বেড়ে যায়।

রাজগৃহ তেওয়ারী বলেন, 'প্রচারটা কীভাবে করতে চান ? দেয়ালে দেয়ালে চৌবেজীর নাম লেখা, পোস্টার লাগানো, মীটিং-মিছিল,

এসব তো আছেই। আর কোনো নয়া 'আইডিয়া' আপনার মাথায় এসেছে কি ?'

'নয়া কিছু না, তবে আমার কথামতো চৌবেজী চললে ভালো কাজ হবে।'

রামচরিত গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, 'কী করতে হবে আমাকে ?'

জগৎনারায়ণ যা উত্তর দেন তা এইরকম। এখন থেকেই রামচরিতকে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে জানাতে হবে তিনি তাঁদের ভোট প্রার্থনা করেন।

অন্য সবাই চমকে ওঠেন। এমন অদ্ভুত মারাত্মক কথা আগে তাঁরা কখনও শোনেন নি।

মনপসন্দ মিশ্রকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন এবং অস্থির দেখায়। শশব্যস্তে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ আপনি কী বলেছেন জগৎনারায়ণজী !'

'কেন, খারাপ কিছু বলেছি ?'

'ভালো-খারাপের কথা নয়। চৌবেজী মাননীয় আদমী, ভোটের জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াবেন, এ অসম্ভব। একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছেন ?'

'কী ?'

'এই ভোটকেন্দ্রে কত অচ্ছুৎ, কত নীচ জাতের মানুষ রয়েছে। রামচরিতজী ভিখমাঙোয়ার মতো তাদের কাছে গিয়ে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াবেন ? আসমানে চান্দা-সূরয থাকতে এ কখনও হয়, না কখনও হতে পারে !'

অন্য সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে মনপসন্দের কথায় সায় দেন।

কিন্তু জগৎনারায়ণ হাল ছাড়েন না। তিনি নিজের প্রস্তাবের পক্ষে এভাবে জোরালো যুক্তি খাড়া করেন। রামচরিতের মতো সম্মানিত মানুষ যদি সবার ঘরে ঘরে যান, তারা হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে যাবে। মনে করবে তাদের চোদ্দ পুরুষ ধন্য হয়ে গেল। এই

সব কৃতজ্ঞ কৃতার্থ মানুষ তখন কি আর অন্য প্রার্থীর দিকে তাকাবে? ভোটের দিন মিছিল ক'রে গিয়ে রামচরিতের প্রতীকের পাশে তারা মোহর মেরে আসবে। চুনাওতে জিততে হলে জনসংযোগটা খুবই জরুরি। হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্য এটা একান্ত প্রয়োজন।

জগৎনারায়ণের যুক্তিতে ধার আছে। রামচরিত খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন জগৎনারায়ণজী; জনসংযোগটা চুনাওর আসল কথা। ভোটের জন্যে আমি লখিনপুরার দরজায় দরজায় ঘুরব।'

স্বয়ং রামচরিত যখন জগৎনারায়ণের কথায় রাজী হয়েছেন তখন অন্যদের আপত্তি করার কী থাকতে পারে! মুহূর্তে তাঁদের মত বদলে যায়। মনপসন্দরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেন, 'হাঁ হাঁ, জনসংযোগটা খুব দরকার। বাড়ি বাড়ি ঘুরলে পদযাত্রার মতো একটা ব্যাপার হবে।'

রামচরিত এবার জগৎনারায়ণকে জিজ্ঞেস করেন, 'কবে থেকে লোকের কাছে যেতে বলেন?'

'কাল থেকেই। এ সব কাজে দেরি করা ঠিক নয়।'

'একটু দাঁড়ান, পঞ্জিকাটা আগে দেখা যাক।'

তক্ষুনি নোকরকে দিয়ে দোতলা থেকে এ বছরের পঞ্জিকা আনিয়ে রামচরিত মনপসন্দের দিকে এগিয়ে দেন, 'দিন দেখে দিন মিশ্রজী—'

দশ মিনিটের মধ্যেই শুভদিন পাওয়া যায়। কাল নয়, পরশু বিকেল তিনটেয় গ্রহের যে যোগাযোগ ঘটছে সেটা জনসংযোগ করার পক্ষে খুবই সুসময়।

ঠিক হয়, পরশু বিকেল থেকেই পদযাত্রায় বেরুবেন রামচরিত।



আজ থেকে জনসংযোগ শুরু করবেন রামচরিত।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বাজলে মনপসন্দের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। টাঙ্গা না, মোটর না, ফীটন না—স্রেফ পায়ে হেঁটে তিনি ভোটারদের কাছে যাবেন।

চার-পাঁচজন নির্বাচন-কর্মীও পেছন পেছন চলল। গেট থেকে বাইরে পা দিয়েই প্রচণ্ড উৎসাহে তাদের একজন গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, 'চৌবেজীকো—'

বাকী কর্মীরা সমস্বরে চেঁচাল, 'ভোট দো, ভোট দো—'

'চৌবেজী জিতনেসে কা মিলেগা?'

'রামরাজ, রামরাজ।'

চৌবেদের বিশাল বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গেলে ডান দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর প্রথমেই পড়ে কায়াথ ঘাসিলালের পাকা দোতলা মকান। রামচরিতের জনসংযোগটা সেখান থেকেই শুরু হয়।

এমনিতে রামচরিতের মাটিতে পা পড়ে না। মাত্র একবারই কাকভোরে নাহানা সেরে পায়ে হেঁটে তিনি রামসীতা মন্দিরে যান। এটুকু বাদ দিলে কেউ তাঁকে ফীটন ছাড়া কখনও রাস্তায় বেরুতে দেখেন নি।

বুড়ো ঘাসিলাল এ অঞ্চলের এতগুলো মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে

রামচরিতকে দেখে একেবারে হকচকিয়ে যায়। মাঝখানে ফাঁকা পড়তি জমিটা না থাকলে বলা যেত তারা রামচরিতের 'পড়োশী'। মাত্র পঞ্চাশ ষাট গজ তফাতে চৌবেদের বাড়ি। তবু কস্মিনকালেও রামচরিত তাদের কোঠিতে পায়ের ধুলো ঝাড়তে আসেন নি।

ঘাসিলাল যে কী করবে, ভেবে পায় না। হৈচৈ বাধিয়ে নিজের স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন পুতহু এবং কয়েক গণ্ডা নাতি-নাতনীকে ডেকে আনে। এ ঘর থেকে ও ঘর থেকে যত ভালো ভালো কুর্শি আছে, সব আনিয়ে সযত্নে পেতে দেয়। তারপর হাত জোড় ক'রে বলে, 'বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে—'

বাড়ির অন্য সবাই বিস্ময়কর অভাবনীয় কিছু দেখছে, এমন মুখ ক'রে ঘাসিলালের মতোই হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামচরিত যত বলেন এখন বসার সময় নেই কিন্তু কে কার কথা শোনে! ঘাসিলাল সমানে বলে যায়, 'কিরপা' ক'রে চৌবেজী যখন গরীবের মকানে এসেই পড়েছেন তখন একটু বসতেই হবে।

অগত্যা বসতেই হয় এবং 'ঠাণ্ডাই'ও খেতে হয়। খেতে খেতে ঘাসিলালের শরীর কেমন আছে, ছেলেরা কে কী করছে, নাতি-নাতনী ক'টি হল—জনসংযোগের পক্ষে এইসব অত্যন্ত জরুরি খবর জেনে নিয়ে আসল কথায় চলে আসেন রামচরিত, 'আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি ঘাসিলালজী—'

বিনয়ে পিঠ বাঁকিয়ে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে দাঁড়ায় ঘাসিলাল। বলে, 'নৌকর আপনার জন্যে কী করবে হুকুম করুন—'

ঘাসিলালের কাছে আসার উদ্দেশ্যটা এবার জানিয়ে দেন রামচরিত। আগামী নির্বাচনে এ বাড়ির সবগুলো ভোট তাঁর চাই।

শুনে ঘাসিলাল বলে, 'এহী বাত! এর জন্যে আপনি এত কষ্ট ক'রে এসেছেন! জরুর আমরা ভোট দেব।' বলেই আচমকা শিরদাঁড়া টান ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'আমাদের বহুত সৌভাগ যে

রামসিংহাসনজীর নাতি আর রামশরণজীর ছেলে রামচরিতজী চুনাওতে নেমেছেন। ভোটের দিন সবাই রামচরিতজীর নামে মোহর মারবি। সমঝা ?' ঘাসিলাল যখন রামচরিতের সঙ্গে কথা বলছিল তখন তার গলার স্বর ছিল খুবই বিনীত, বশংবদ নৌকরের মতো। কিন্তু এখন তার চোখমুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর একেবারেই বদলে গেছে। তার গলা এখন গমগমে এবং গম্ভীর। প্রবল প্রতাপে সে যে সংসার চালায়, বাড়ির লোকজনের ওপর তার দাপট যে অপরিসীম, সেটা মুহূর্তে টের পাওয়া যায়।

স্ত্রী, ছেলে এবং ছেলের বৌরা তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে জানায়, রামচরিতের প্রতীকের পাশে ছাড়া অন্য কোথাও মোহর মারবে না।

বেশ খানিকটা সময় ঘাসিলালের বাড়ি কাটিয়ে কায়াথ সীয়াশরণের বাড়ি আসেন রামচরিতরা, সেখান থেকে বজরঙ্গী প্রসাদের মকানে। এইভাবে বাড়ির পর বাড়ি।

এখানে চাপ বেঁধে পর পর যে পঞ্চাশটা বাড়ি রয়েছে, তার সবগুলোই কায়াথদের। এ কারণে জায়গাটার নাম হয়েছে কায়াথটুলি।

রামচরিত যেখানেই যাচ্ছেন সে বাড়ির লোকজন মনে করছে, আকাশের 'চান্দা-সুরয' তাদের কোঠিতে নেমে এসেছে। প্রচুর খাতিরদারি করা হচ্ছে তাঁদের, 'ঠাণ্ডাই' না খাইতে কেউ ছাড়ছে না। এবং সবাই কথা দিচ্ছে রামচরিতকে ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবে না।

এদিকে রামচরিতরা যে ভোটের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, এ খবরটা কীভাবে যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে প্রচুর লোকজন জমা হয়েছে। রামচরিতরা যেখানেই যাচ্ছেন ভিড়টা [তাঁদের পিছু পিছু হাঁটছে।

কার্তিকের বিকেল যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফুরিয়ে এল তখন কায়াথটুলির

মোটে সতেরটা বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি তেত্রিশটা বাড়ি এখনও বাকি। তবে যেখানেই রামচরিত গেছেন, সবাই কথা দিয়েছে ভোট দেবে। তাদের খাতিরদারি এবং বিনয়ের নমুনা দেখে মনে হয়েছে, রামচরিতের প্রতীকে মোহর মারতে পারলে তাদের চোদ্দপুরুষ কৃতার্থ হয়ে যাবে।

একসময় রামচরিত বলেন, 'আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল পুরা কায়াথটুলিটা শেষ ক'রে ফেলব।'

জগৎনারায়ণ বলেন, 'কী হল চৌবেজী, টায়ার্ড লাগছে?' মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে দু-একটা ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দেন তিনি।

রামচরিত বলেন, 'না না, কতটুকু আর ঘুরেছি। এর মধ্যে 'থকে' যাবার মতো কিছু হয় নি। তবে 'ঠাণ্ডাই' খেয়ে খেয়ে পেট ঢোল হয়ে উঠেছে। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই 'ঠাণ্ডাই'। আর পারছি না।'

একটু মজা ক'রে রাজগৃহ বলেন, ঠাণ্ডাই-এর ভয়েই তবে পালাচ্ছেন!'

রামচরিত হাসেন, 'যা বলেছেন।'

সবাই হাসতে থাকেন।

আজকের মতো জনসংযোগের কাজ চুকিয়ে রামচরিতরা বাড়ির দিকে ফিরতে থাকেন।

উৎসুক জনতার ভিড় আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসে। শুধু দশ-পনের জন রামচরিতদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। যে চুনাও-কর্মীরা সঙ্গে এসেছিল, মাঝে মাঝে শ্লোগান দিয়ে আবহাওয়াটাকে সরগরম ক'রে তোলে।

'রামচরিতজীকো—'

'ভোট দো, ভোট দো।'

রাস্তায় এখন প্রচুর সাইকেল রিকশা। সেগুলো রামচরিতদের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে চলে যাচ্ছে। অগুনতি টাঙ্গাও চোখে পড়ছে। অনেকগুলো টাঙ্গায় বসে আছে নানা বয়সের মেয়েরা। আজ ছট

পরব। সকালে ওরা সূর্যকে 'অরঘ' (অর্ঘ্য) দেবার জন্য দূরের এক নদীতে গিয়েছিল। এখন ফিরে আসছে।

নীচু গলায় গুনগুনিয়ে আওরত্তেরা গাইছে ঃ

'দোহরি সুপ অরঘ হাম দেবো
যাইব যমুনাকে তীর, ছটী মাঈয়া
বেটি পুতহিয়া আগু করি লিব
ধরবো চরণ তুহার
ছটী মাঈয়া দোহরি ডালিয়া অরঘ…'

তাদের গুনগুনানির মিষ্টি কোমল সুর কার্তিকের টান-ধরা বাতাসে অনেক দূরে ভেসে যেতে থাকে।

যদুনন্দন বলেন, 'আজ ছট পরব ; দিনটা খুবই ভালো। শুভদিনে জনসংযোগের কাজটা শুরু হল। ফল ভালো হবে।'

অন্য সবাই রীতিমত জোরালো গলায় সায় দেন, 'জরুর—'

রামচরিত দূরমনস্কর মতো কিছু ভাবছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলেন, 'কায়াথটুলিতে যে ঘুরলাম, আপনাদের কী মনে হল ? ওরা আমাকে ভোট দেবে ?'

সঙ্গীরা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। এমন বিস্ময়কর কথা আগে তারা আর কখনও শোনেন নি। সবার প্রতিনিধি হিসেবে রাজগৃহ বলে ওঠেন, 'ক্যা তাজ্জবকা বাত ! কায়াথটুলিতে গিয়ে কী শুনলেন চৌবেজী ? লোকগুলো কী বলল ?'

'মুখে তো বলল ভোট দেবে। সামনাসামনি তো আর না বলতে পারে না। লেকেন—'

'লেকেন ক্যা ?'

'ওদের মনে কী আছে কে জানে। পরচিত্ত অন্ধকার। বিলকুল আন্ধেরা।'

শুনতে শুনতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েন জগৎনারায়ণ। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুষি কষিয়ে বলেন, 'আপনি নিজে

ওদের মকানে মকানে গেছেন ; এর রি-অ্যাকসান কী হতে পারে, ভাবতে পারেন ! ভোট ওরা আপনাকে দেবেই। অন্য ক্যাণ্ডিডেটদের জামানত জব্দ হয়ে যাবে।'

জগৎনারায়ণের উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা তাঁরই পরিকল্পনায় এই পদযাত্রা এবং জনসংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রামচরিত কি বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা রাস্তার ওধার থেকে কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, 'নমস্তে বড়ে সরকার—'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই রামচরিত দেখতে পান, নৌটঙ্কীওলা ঠাণ্ডিলাল তিরিশ ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সেই আধভাঙা 'ফলুট' ; তার পাশে রেণ্ডিপাড়ার সেই বেজন্মার দলটা।

ছট পরবের শুভদিনে একটা ভালো কাজ থেকে ফিরছেন, আর কিনা ঐ ভূচ্চরের ছোঁয়াটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ! নোংরা বজ্জাত লোকটা যেন তাকে ধরার জন্য অনেক আগে থেকেই ওখানে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা হঠাৎ ভীষণ খারাপ হয়ে যায় রামচরিতের।

চোখাচোখি হতেই ট্যারাবাঁকা হলদে দাঁত বার ক'রে ভাঙাচোরা মুখে হাসে ঠাণ্ডিলাল। বলে, 'কা সরকার, ভিখমাঙোয়াদের মতো ভোট মাঙতে বেরিয়েছিলেন ? 'এম্লে' বনবেন ? মনিস্টার বনবেন ?' একটু থেমে গলার ভেতর অদ্ভুত ধরনের একটা সুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেয়ে ওঠে, 'লখিনপুরকে বড়ে সরকার মনিস্টার বনেগা ! হোয় হোয় হোয়—'

আগেও একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে অনেক লোকজনের সামনে তাঁকে নিয়ে তামাসা করেছিল ঠাণ্ডিলাল। সেদিন পাগলের প্রলাপ বলে শেষ পর্যন্ত ধরে নিলেও আজ আর তা মনে হচ্ছে না। রীতিমত সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে 'হারামজাদকে বাচ্চা' তাঁর পেছনে লেগেছে। অসহ্য রাগে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে আসে রামচরিতের। আজ হয়ত তিনি কিছু একটা করে বসতেন, তার আগে তাঁর চুনাও-কর্মীরা ঠাণ্ডিলালকে তাড়া ক'রে যায়, 'এ শালে, এ গিদ্ধড়—'

এবার এক কাণ্ডই ক'রে বসে ঠাণ্ডিলাল। আচমকা পেছন ফিরে পরনের তালিমারা ঠেটি প্যান্টটা খুলে চুনাও-কর্মী এবং রামচরিতদের পাছা দেখিয়েই সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটতে থাকে; তার পেছন পেছন বেশ্যাপাড়ার বেজন্মাগুলোও দৌড় লাগায়। মুহূর্তে ওধারের একটা গলিতে তারা উধাও হয়ে যায়। চুনাও-কর্মীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেও তাদের ধরতে পারে না।

মনপসন্দ বলেন, 'পাগল কাঁহিকা!'

রামচরিত দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'পাগল নেঁহী; এক নম্বরের হারামজাদ। ওর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'



আরো ক'দিন কেটে যায়।

নির্বাচনের তারিখ যত এগিয়ে আসছে, লখিনপুরার আবহাওয়া ততই সরগরম হয়ে উঠতে থাকে।

প্রথমে ধরেই নেওয়া হয়েছিল, অন্য ক্যাণ্ডিডেটদের জামানত বরবাদ না হোক, তাদের রীতিমত গো-হারা হারিয়ে জিতে যাবেন রামচরিত। কিন্তু এখানকার নির্বাচনী লড়াইর প্যাটার্নটা তিন চার দিন হল হঠাৎ বদলে গেছে। তার ফল হয়েছে এই, লখিনপুরায় এখন প্রচণ্ড উত্তেজনা।

দোসাদ এবং ধাওড়দের মধ্যে আবহমান কাল ধরে যে রেষারেষি এবং শত্রুতা চলে আসছে, দিন চারেক আগে সেটা একেবারে মিটে গেছে। কীভাবে, কার উদ্যোগে এই সমঝোতাটা হল, জানা যায় নি। তবে ওরা ঠিক করেছে, এবারের নির্বাচনে দু'জন প্রার্থী দিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি ক'রে শক্তি ক্ষয় করবে না। অচ্ছুৎ নীচু বর্ণের মানুষ এবং গরীবদের স্বার্থে একজন প্রার্থীই নির্বাচনে লড়বে। অনেক আলোচনা এবং পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সুখদেওপ্রসাদ তার নাম তুলে নেবে। সেই অনুযায়ী গভর্নমেন্টকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। এখন ওদের একমাত্র প্রার্থী ধরতীলাল।

এ গেল একটা দিক ; আরেক দিক থেকেও মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের কারা খুঁচিয়েছে কে জানে। তার

ফলে যোশেফ গিরধর এবং শেখ নিজামুদ্দিনও হঠাৎ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ওরা সবাই চুনাওতে ধরতীলালকে মদত দেবে। শোনা যাচ্ছে, পাটনা এবং দিল্লী থেকে কয়েকজন নাম করা হরিজন নেতা আসবেন। ধরতীলালের জন্য তাঁরা মীটিং মিছিল করবেন; এমন কি সময় পেলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটদাতাদের বোঝাবেন, ধরতীলালকে ভোট দেওয়াটা কেন বিশেষভাবে জরুরি।

আজকাল হাওয়ায় হাওয়ায় একটা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। এই যে ধরতীলালের পেছনে অচ্ছুৎ, জল-চল নীচু বর্ণের হিন্দু, খ্রীস্টান এবং মুসলমানেরা জোট বেঁধেছে তার কারণ নাকি রামচরিত। কীভাবে যেন ওদের মধ্যে রটে গেছে, উঁচু বর্ণের মানুষদের, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণদের হাতে যাতে দেশের সব কিছু—যেমন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা আর ধর্মের ওপর আধিপত্য বজায় থাকে—সেই কারণেই রামচরিত এবার চুনাওতে নেমেছেন। দুনিয়ায় রাজনৈতিক শক্তিই সব চাইতে বড় শক্তি। তার জোরে সব কিছুই হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়। নইলে যে চৌবেরা কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান না, পুরুষানুক্রমে হাজার বিঘা জমিজমা আর রামসীতা মন্দির নিয়েই মেতে আছেন, সেই বংশের ছেলে হয়ে রামচরিত হঠাৎ চুনাওতে নামবেন কেন?

লখিনপুরার এবারকার নির্বাচনী লড়াইটা যা দাঁড়িয়েছে তা এই-রকম। এর একদিকে আছে উঁচু বর্ণের হিন্দু, আরেক দিকে অচ্ছুৎ, নিচু বর্ণের জল-চল হিন্দু আর সংখ্যালঘুরা। অবশ্য ত্রিভুবন সিং নামে যে রাজপুত ক্ষত্রিয়টি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছে সে নাম তুলে নেয় নি। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

প্রথম দিকে ভাবা গিয়েছিল, তুড়ি মেরেই নির্বাচনী যুদ্ধ জিতে যাওয়া যাবে কিন্তু ক্রমশ রামচরিত টের পাচ্ছেন ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

ব্রাহ্মণদের ভোট তিনি মোটামুটি সবটাই পাবেন। কায়াথদের

বেশির ভাগ ভোটও তাঁর বাক্সেই পড়বে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেরকম ধারণাই হয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়াথ ছাড়াও এই নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রচুর অচ্ছুৎ, জল-চল নিচু স্তরের হিন্দু এবং সংখ্যালঘুরা রয়েছে। ভোটদাতাদের তালিকায় যে সব নাম আছে তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই ওরা। এতগুলো ভোটারকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

খবর পাওয়া যাচ্ছে, ধরতীলালও তাঁর মতোই বাড়ি বাড়ি ঘুরে পদযাত্রা এবং জনসংযোগ ক'রে চলেছে। বিশেষ ক'রে অচ্ছুৎটুলি-গুলোতে আর খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের পাড়ায় পাড়ায় সে বেশি ক'রে হানা দিচ্ছে।

একেবারে গোড়ার দিকে রামচরিত মনে মনে ঠিক ক'রে রেখে-ছিলেন, ব্রাহ্মণ এবং কায়াথদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাবেন না। তাঁর মতো গোঁড়া চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে অচ্ছুৎটুলি বা মাইনো-রিটিদের পাড়ায় যাবার কথা ভাবাও যায় না। কিন্তু আবহাওয়া এবং অবস্থা রাতারাতি বদলে গেছে। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ কায়াথের ভোটের ওপর এখন আর নির্ভর করে বসে থাকা যাচ্ছে না। এরা সবাই যে তার প্রতীক-চিহ্নে মোহর মারবে তার গ্যারান্টি নেই। কেননা সামনা-সামনি কিছু না বললেও এদের তু-চারজনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে ভোট না-ও দিতে পারে। কেউ কেউ তো হেসে হেসে বলেই ফেলেছে, 'আপনি কিরপা ক'রে আমাদের বাড়ি এসেছেন, এ আমাদের বহুত বড়ে সৌভাগ। লেকেন চুনাওতে না নামলে আপনার পায়ের ধুলো কি এখানে পড়ত!' কথাগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম খোঁচা এবং ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ গরজে পড়েছ বলেই তুমি ছুটে এসেছ, নইলে ইহজন্মেও আসতে না। নিজের বড়মানুষি, বড় চাল এবং অহঙ্কার নিয়ে দূরেই থেকে যেতে। এই জাতীয় লোকেরা ভোটে কার নামে ছাপ মেরে আসবে বলা মুশকিল।

ওদিকে অচ্ছুৎ এবং মাইনোরিটি ভোট পুরোটাই পেয়ে যাবে

ধরতীলাল। যেভাবে মুসলমান খ্রীস্টান ধাঙড় দোসাদরা তার পেছনে একজোট হয়েছে তাতে এটা জোর দিয়েই বলা যায়। ধরতীলালের এই সলিড ভোটগুলো থেকে কিছু ভাঙাতে পারলে অনিশ্চয়তা কাটত। কিন্তু এটা করতে হলে তো হাতজোড় ক'রে অচ্ছুৎটুলি আর সংখ্যা-লঘুদের পাড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ভাবতেই শরীরের ভেতরটা কুঁকড়ে যায় রামচরিতের।

এখন এমন একটা জায়গায় তিনি পৌঁছে গেছেন যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। প্রথমত নামটা তুলে নিলে ধরতীলাল বাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জিতে যাবে। মীটিং মিছিল পদযাত্রা জনসংযোগ, কোনো কিছুরই দরকার হবে না তার। দ্বিতীয়ত, ধরতীলাল জিতে গেলে হিন্দুধর্মের সুরক্ষা এবং বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ব্যাপারে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। তৃতীয়ত, চুনাও থেকে হঠাৎ নাম তুলে নিলে গিধের বাচ্চারা বলে বেড়াবে একটা অচ্ছুতের ভয়ে তিনি সরে গেলেন। কাজেই যে নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেছেন সেখান থেকে পিছু হটা আর সম্ভব না। চ্যালেঞ্জের সামনে তাঁকে দাঁড়াতেই হবে।

আজ সন্ধেবেলা জনসংযোগ এবং পদযাত্রা সেরে আসার পর রামচরিতদের বিশাল বৈঠকখানায় জরুরি আলোচনা শুরু হল। ক'দিন ধরেই মাইনোরিটি এবং অচ্ছুৎদের ভোট কীভাবে টেনে আনা যায়, তাই নিয়ে প্রচুর তর্কাতর্কি হয়েছে কিন্তু সুষ্ঠু সম্মানজনক কোনো ফরমুলা বার করা যায় নি। আজ যেভাবেই হোক, এই ফরমুলাটা পেতেই হবে। কেননা যত দিন যাচ্ছে, রামচরিতের জেতার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ততই বেড়ে চলেছে।

মনপসন্দের মতো যাঁরা মারাত্মক গোঁড়া তাঁরা চান না, রামচরিত অচ্ছুৎটুলিতে বা খ্রীস্টান ট্রাস্টানদের পাড়ায় যান! ওঁদের ইচ্ছা, ঐ সব নরকে না গিয়েই কীভাবে ওদের ভোট পাওয়া যায় তার রাস্তা বার করা।

জগৎনারায়ণ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ ক'রে ডাক্তার হয়েছেন। বেশ কয়েকটা বছর বাঙালীদের সঙ্গে মেশার কারণে এবং কলকাতার মতো বিশাল শহরের কসমোপলিটান আবহাওয়ায় থাকার ফলে ছুয়াছুত বা জাত-পাতের ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে খানিকটা আলগা হয়ে গেছে।

জগৎনারায়ণ বলেন, 'দু-পাঁচ মিনিটের জন্যে অচ্ছুৎটুলিতে গেলে ক্ষতিটা কী?'

কট্টর গোঁড়া মনপসন্দ মিশ্র হাঁ হাঁ ক'রে ওঠেন, 'কভী নেঁহী।' ঐ সব জায়গার মিট্টি অশুধ্, হাওয়া অশুধ্। রামচরিতজীর মতো সৎ শুধ্ পবিত্র ব্রাহ্মণের ওখানে যাওয়া ঠিক নয়।'

বাকী সবাই সমস্বরে সায় দেন, 'ঠিক বাত—'

বাইরে থেকে দেখলে বা তাঁর কথা শুনলে জগৎনারায়ণকে অনেকখানি লিবারেল মনে হয়। আসলে তিনি চতুর এবং কৌশলী। তিনি বলেন, 'ছুয়াছুতের অত কড়াকড়ি নিয়ে থাকলে চলে না ; জমানা অনেক বদলে গেছে। একটা কথা আপনারা ভেবে দেখুন ; একবার অচ্ছুৎটুলি কি খ্রীস্টানটুলিতে গিয়ে দাঁড়ালে যদি কাজের কাজ হয়ে যায়, আপত্তি কিসের? চুনাওতে জেতাটাই আসল কথা। নইলে ব্রাহ্মণত্ব টিকিয়ে রাখা যাবে না ; দেশ অচ্ছুৎ আর মাইনোরিটিদের হাতে চলে যাবে।'

জগৎনারায়ণের যুক্তির ভেতর ফাঁক নেই। তবু মনপসন্দ গাঁইগুঁই করতে থাকেন, 'হাজার হোক, রামচরিতজী বহুত বড় বংশের শুধ্ ব্রাহ্মণ ; গাঙ্গাতো দোসাদ চামারদের কাছে গিয়ে ভোটের জন্যে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াবেন, এ ভাবাই যায় না।' নিজের অনিচ্ছা তিনি গোপন রাখেন না।

রামচরিত এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন ; এবার ধীরে ধীরে বলে ওঠেন, 'জগৎনারায়ণজী ঠিক কথাই বলেছেন অচ্ছুৎ খ্রীস্টান আর মুসলমানদের কাছে একবার যাওয়া দরকার। মুসিবতটা কোথায়

জানেন ? চুনাওতে ব্রাহ্মণ কায়াথের ভোটের যা দাম, ওদের ভোটেরও সেই একই দাম।'

বিষ্ণুকান্ত এধার থেকে বলেন, 'এই সিস্টেমটাই খারাপ। দেখবেন সবাইকে এক লেভেলে নামিয়ে আনার ফল একদিন কী মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।' তাঁকে একই সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত দেখায়।

জগৎনারায়ণ শান্ত মুখে বলেন, 'একদিন কী হবে না হবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আগে পলিটিক্যাল পাওয়ারটা দখল করুন, পরে এখনকার সিস্টেম ভাঙবেন। অচ্ছুৎটুলিতে রামচরিতজীর যাবার ব্যাপারে আমি একটা ফরমুলা দিচ্ছি ; দেখুন আপনাদের পছন্দ হয় কিনা—'

সবাই উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকান।

জগৎনারায়ণ এবার যা বলেন তা এইরকম। রামচরিতজী অচ্ছুৎ-টুলিতে যাবার আগে মাথায় পবিত্র গঙ্গাপানি ছিটিয়ে নেবেন ; তা ছাড়া অচ্ছুৎটুলি বা খ্রীস্টানটুলির যে সব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবেন আগে থেকেই সেখানে গঙ্গাপানি ঢেলে শুদ্ধ ক'রে রাখা হবে। ফিরে আসার পর গায়ের জামাকাপড় ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে আবার মাথায় গঙ্গাপানি ছিটোবেন। এতে তাঁর শুদ্ধতা পুরোপুরি বজায় থাকবে।

'মন্দের ভালো' হিসেবে এই ফরমুলা শেষ পর্যন্ত সবাই মেনে নেন। ঠিক হয় আসছে সপ্তাহের গোড়ার দিকে পর পর তিন দিন রামচরিত তাঁর নির্বাচনী টীম নিয়ে মুসলমান খ্রীস্টান এবং অচ্ছুৎদের কাছে যাবেন।

বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। মনপসন্দরা আর বসেন না ; উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, 'আজ যাওয়া যাক।'



সবাইকে বিদায় দিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে চলে আসেন রামচরিত।

দুই দেয়ালে দুটো চড়া আলো জ্বলছে। রামচরিত দেখলেন গোমতী তাঁর খাটে ঘুমোচ্ছেন। ধবধবে নেটের মশারির ভেতর চর্বির ঢিবির মতো তাঁর বিপুল থলথলে শরীর গাঢ় নিঃশ্বাসের তালে তালে একটানা দুলে যাচ্ছে। সমানে নাকও ডাকছে গোমতীর। যখন থেকে তিনি মোটা হতে শুরু করেছেন, তাঁর নাক ডাকারও আরম্ভ তখন থেকেই।

মেয়েমানুষের নাকডাকা একেবারেই পছন্দ করেন না রামচরিত। বিরক্ত চোখে কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

ঘুমোতেও পারেন গোমতী। সারাদিন গোটা বাড়ি তিন চারবার ধোয়ানো এবং পাঁচ সাতবার স্নানের পর এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে সন্ধে হতে না হতেই দু চোখ জুড়ে আসে।

ঘুমের ঘোরেই জড়ানো গলায় স্বামীর উদ্দেশে গোমতী বলে ওঠেন, 'আয়া তুম?' ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি টের পান, কে ঘরে ঢুকছে না ঢুকছে। এ এক অলৌকিক ক্ষমতা।

'হাঁ—' রামচরিত সাড়া দেন।

'সারাদিন ভোট ভোট ক'রে এখানে ওখানে ঘুরেছ। কুলুঙ্গিতে গঙ্গাপানি আছে। মাথায়, কাপড় চোপড়ে ছিটিয়ে নাও।'

'হাঁ।'

গোমতীকে শুচিবাইতে ধরবার পর থেকে এত গঙ্গাপানি তুলে এনে রামচরিতের মাথায় ছিটানো হচ্ছে যে জল কমতে কমতে একদিন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাই হয়ত শুকিয়ে যাবে। কুলুঙ্গি থেকে পবিত্র জল নিয়ে মাথায় ছিটোতে থাকেন রামচরিত।

ততক্ষণে ঘুমন্ত গলাতেই গোমতী ডাকতে থাকেন, 'এ বিরজিয়া, বিরজিয়া—'

পাশের ঘর থেকে খাস নৌকরনীর গলা ভেসে আসে, 'হাঁ—'

'সরকারকা খানা লাও—'

'লাতী হ্যায়।'

একটু পরে গরম গরম পুরী সবজি ডাল ভাজি ক্ষীর এবং মিঠাই এনে একটা ছোট টেবলে সাজিয়ে দেয় বিরজিয়া।

লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে গোমতী আজ আর উঠবেনও না, খাবেনও না। মাসের মধ্যে এরকম পাঁচ সাতদিন রাত্তিরে না খেয়ে কাটিয়ে দেন তিনি। তাঁর এই উপোসের তিনটি কারণ। তৌহার বা পুজোপার্বণ, শরীর খারাপ এবং আলস্য। যে দিন কোনো পুজো টুজো থাকে সেদিন তিনি জল পর্যন্ত ছোঁন না, শরীর খারাপ হলে তো কথাই নেই। আর শুয়ে পড়লে তাঁকে ওঠানো খুবই দুরূহ ব্যাপার।

রামচরিত বলেন, 'তুমি খাবে না?'

গোমতী বলেন, 'নেঁহী, তবিয়ত ঠিক নেহী।'

অগত্যা রামচরিত খেতে বসে যান। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তাঁর খাওয়ার তদারক করতে থাকেন গোমতী, 'এ বিরজিয়া, সরকারকো আউর দোগো পুরি দো, ভাজিয়া দো, লাড্ডু দো—'

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় বাইরের বারান্দায় চাপা গলার ডাক ভেসে আসে, 'বড়ে সরকার—'

চেনা গলা। রামচরিত দরজার বাইরে তাকিয়ে বলেন, 'কৌন্, ঘমণ্ডি?' ঘমণ্ডি তাঁর খাস নৌকর।

'জী সরকার—' বলে গলার স্বর আরো নীচু খাদে নামিয়ে দেয়

ঘমণ্ডি, 'ও আয়া হ্যায়।'

খাস নৌকর কার কথা বলছে, মুহূর্তে বুঝতে পারেন রামচরিত। বলেন, 'কেউ দেখে নি তো ?'

'নহী—'

'কোথায় বাসিয়েছিস ওকে ?'

'যেখানে বরাবর বসে।'

'ঠিক আছে, তুই নিচে যা। আমি কিছুক্ষণ পর আসছি।'

ঘমণ্ডি চলে যায়। আর দ্রুত খাওয়া চুকিয়ে ফেলেন রামচরিত। পাশের বাথরুম থেকে তাঁর মুখ ধুয়ে ফিরে আসার ফাঁকে বিরজিয়া এঁটো বাসনকোসন তুলে নিয়ে যায়।

রামচরিত যখন বেরুতে যাবেন, গোমতী ঘুমের ঘোরেই বলে ওঠেন, 'গঙ্গাপানি সঙ্গে নিয়ে যাও। চৌপটলালের টাকাগুলোতে ছিটিয়ে শুধ্ ক'রে নিয়ে এসো।'

গোমতীর ইন্দ্রিয়গুলো যে কত প্রখর ভাবতে ভাবতে তাজ্জব বনে যান রামচরিত। ঘমণ্ডি এত চাপা গলায় কথা বলেছে যে সেই শব্দ গোমতীর কান পর্যন্ত পৌঁছুবার কথা নয়। তা ছাড়া চৌপটলালের নাম একবারও সে করে নি। তবু সব টের পেয়ে গেছেন গোমতী।

'ঠিক হ্যায়—'

কুলুঙ্গিতে নানা মাপের শিশি এবং বোতলে গঙ্গাজল রয়েছে। একটা শিশি আর ছোট টর্চ পকেটে পুরে নিচে নেমে যান রামচরিত।

ঘমণ্ডি সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল। রামচরিতকে দেখে নিঃশব্দে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় নেমে, অনেকটা ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে আসে। রামচরিতও তার সঙ্গেই চলতে থাকেন।

এখানে ডান পাশে হাতীদের জন্য অ্যাসবেস্টসের লম্বা লম্বা শেড। মাহুতরাও শেডেরই একধারে থাকে। আর বাঁ পাশে চুনাও-কর্মীদের অস্থায়ী ক্যাম্প।

চুনাও-কর্মীরা এখন কেউ রাত্তিরে থাকছে না। সন্ধে হতে না

হতেই চলে যাচ্ছে। নির্বাচনের এখনও কিছুদিন দেরি। তারিখটা যত এগিয়ে আসবে ততই কাজও বেড়ে যাবে; তখন এখানেই ওদের রাত কাটাতে হবে।

এই মধ্যরাতে বাড়ির পেছন দিকটা একেবারে নিঝুম। মাহুত বা হাতীরা কেউ জেগে নেই। শুধু মাঝে মাঝে হাতীদের কান এবং শুঁড় নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে।

হাতীদের ইন্দ্রিয় খুবই সজাগ; সামান্য আওয়াজেই তাদের ঘুম ছুটে যায়।

টর্চ জ্বালতেও ভরসা পাচ্ছেন না রামচরিত। আলো টালোতে ঘুমের ব্যাঘাত হলে জেগে উঠেই বিশাল প্রাণীগুলো বিকট চিৎকার জুড়ে দেবে; তাই শুনে মাহুতরাও উঠে পড়বে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার।

গভীর রাতে চৌপটলালের সঙ্গে তিনি যে দেখা করতে যাচ্ছেন, এটা জানাজানি হোক—কোনোভাবেই রামচরিত তা চান না। ঘমণ্ডি অবশ্য সব কিছুই জানে। কিন্তু সে খুবই বিশ্বাসী; তার আনুগত্য এবং প্রভুভক্তির তুলনা নেই। কোপ দিয়ে ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে ফেললেও তার গলা দিয়ে চৌপটলাল সম্পর্কে টুঁ শব্দটি বেরুবে না।

পা টিপে টিপে চুনাও-কর্মীদের ক্যাম্পগুলোর পাশ দিয়ে একেবারে পেছন দিকের বাউণ্ডারি ওয়ালের কাছে চলে আসেন দু'জনে। এখানে ছোট্ট একটা দরজা আছে। ঘমণ্ডি দরজাটা খুলে আগে বেরিয়ে যায়, তারপর রামচরিত।

ডান পাশে কয়েক পা গেলেই বাউণ্ডারি ওয়ালের গায়ে একটা ছোট ঘর। ঘরটা সারাক্ষণই তালা বন্ধ থাকে; শুধু মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন গভীর রাতে চৌপটলাল নোংরা কৃমির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে যখন আসে তখন তালাটা খোলা হয়।

চৌপটলালের আসাটা খুবই অদ্ভুত ধরনের। ফী মাসে পনের থেকে আঠার তারিখের ভেতর একদিন মাঝরাতে সে বাড়ির এই পেছন দিকে এসে বার তিনেক টর্চ জ্বালায় এবং নেভায়। এটা সংকেত। ঐ

চারদিন রাত গাঢ় হলেই ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে ঘমণ্ডি। টর্চের জ্বলা-নেভা দেখলেই রামচরিতকে খবর দিয়ে এই তালাবন্ধ ঘর খুলে দেয়।

একটা নির্দিষ্ট তারিখের বদলে চারটে দিন যে চৌপটলালের জন্য ধরে রাখা হয়েছে তার কারণ সতর্কতা। বেশ্যার দালালটাকে হুঁশিয়ার ক'রে দেওয়া হয়েছে, গভীর রাতে এখানে আসতে আসতে হঠাৎ কোনো লোকজন চোখে পড়লে সে যেন তক্ষুনি ফিরে যায়। লখিনপুরার একটি মানুষও জেগে নেই, এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলে তবেই যেন সে আসে।

অন্ধকারে ঘমণ্ডির চাপা গলা শোনা যায়, 'চৌপটলাল, বড়ে সরকার আয়া হ্যায়—'

'নমস্তে সরকার—' এই গলাটা চৌপটলালের। কার্তিকের কুয়াশামাখা ঘন অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। তবে মানুষের দেহের একটা আবছা কাঠামো দ্রুত নুয়ে পড়েই আবার খাড়া উঠে দাঁড়ায়। টের পাওয়া যায়, রামচরিতের উদ্দেশে মাটিতে সে মাথা ঠেকিয়েছিল।

রামচরিত নিঃশব্দে প্রাপ্য বুঝে নেবার মতো ক'রে প্রণামটি বুঝে নেন। যদিও বিষ্ঠার পোকাটা পাঁচ হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাতাসে তার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে আর সেই নিঃশ্বাসের খানিকটা বাতাসের সঙ্গে রামচরিতের নাকের ভেতর দিয়ে তাঁর বিশুদ্ধ শরীরে ঢুকে যাচ্ছে তবু কিছু করার নেই। যে লোক নগদ টাকা দিতে এসেছে সে যদি পাপের খাস তালুক থেকেও উঠে আসে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হয়।

খুট ক'রে একটা শব্দ হয়। বোঝা যায়, বন্ধ ঘরের তালা খুলে ফেলেছে ঘমণ্ডি। পরক্ষণেই একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। লণ্ঠন দেশলাই কেরোসিন সবই এখানে মজুত থাকে।

এর পর যান্ত্রিক নিয়মে প্রথমে ঘরে ঢুকে একটা ছোট চেয়ারে বসেন রামচরিত। তারপর ঢোকে চৌপটলাল।

চোখের কোণ দিয়ে এক পলক চৌপটলালকে লক্ষ্য করেন রামচরিত। তাকানো মাত্র বোঝা যায়, লোকটা এখানে আসার আগে স্নান করেছে। তার পরনে পরিষ্কার চুস্ত, কামিজ ; তার ওপর কাচএবং পুঁতি-বসানো ক্যাটকেটে সবুজ রঙের হাত-কাটা খাটো কোট ; মাথায় কাজ করা বেনারসী টুপি। মুখ নিখুঁত কামানো ; শুধু সরু গোঁফ দু-ধারে গালের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়তে পড়তে থমকে গেছে।

রামচরিতের সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে কী বারই সে দাড়ি কামায়, নাহানা সারে, নোংরা চুস্ত টুস্ত বদলে নিজেকে যতটা সম্ভব সাফ সুতরো ক'রে নেয়।

মাথার টুপি খুলে সেটার ভাঁজ থেকে ধবধবে নতুন রুমালে বাঁধা একশো টাকার দশখানা নোট মাটিতে নামিয়ে রাখে চৌপটলাল। সসম্ভ্রমে বলে, 'হুজৌর হাজার রুপাইয়া—'

মধ্যরাতে চৌপটলালের এই টাকা দিতে আসার পেছনে পঞ্চাশ ষাট বছরের একটানা গোপন একটা ইতিহাস আছে। সেটা এই রকম।

সারা দেশ তোলপাড় ক'রে হিন্দুধর্মের সুরক্ষার জন্য লখিনপুরা টাউনের একপ্রান্তে বিশাল রামসীতা মন্দির বানিয়েছিলেন রামসিংহাসন। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে নিঃশব্দে টাউনের আর এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রেণ্ডিটুলি।

রামসিংহাসনের স্ত্রী জানকী ছিলেন চিররুগ্ন। বিয়ের দু বছরের মাথায় একটি ছেলে হয় তাঁর, সেই ছেলেই রামচরিতের বাবা রামশরণ। আরো দেড় বছর বাদে দু নম্বর বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে জানকী সেই যে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তারপর আর কখনও সুস্থ হন নি।

তাঁর দ্বিতীয় বাচ্চাটা বাঁচে নি ; মরা অবস্থাতেই পেট থেকে বেরিয়েছিল। নিজে তো সে বাঁচলই না, জানকীকেও মেরে রেখে গেল। কী একটা গোলমালে কোমরের তলা থেকে শরীরের নিচের দিকটা এক মাসের ভেতর পুরোপুরি অসাড় হয়ে গিয়েছিল জানকীর ; ফলে সেই যে তিনি বিছানা নিলেন, আর কখনও ওঠেন নি। তখন

রামসিংহাসন আটাশ বছরের পূর্ণ যুবক—নীরোগ সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান।

জানকী ছিলেন ঘোর অবিবেচক। সতী সাধ্বী হলেও তাঁকে পতিগতপ্রাণ মনে করার কারণ নেই। টপ ক'রে মরে গিয়ে যে রামসিংহাসনের সুখের ব্যবস্থা ক'রে যাবেন তেমন সুবুদ্ধির পরিচয় তিনি কখনও দেন নি। পক্ষাঘাত নিয়ে টানা পঁয়ত্রিশটি বছর জানকী বেঁচে ছিলেন।

রুগ্ন শয্যাশায়ী স্ত্রী নিয়ে দীর্ঘ জীবন কাটানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। ইচ্ছে করলে আরো কয়েক গণ্ডা বিয়ে করতে পারতেন রামসিংহাসন। কিন্তু চতুর্বেদী বংশের পুরুষেরা খুবই একনিষ্ঠ। এক স্ত্রী থাকতে দু নম্বর বিয়ের কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম, তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, স্বর্গনরক, পরলোকের জন্য চিন্তা—এ সব বড় বড় ভাবনা যেমন রামসিংহাসনের মাথায় রয়েছে তেমনি শরীর এবং তার ধর্ম বলেও একটা খুব জোরালো ঐহিক ব্যাপারও আছে। সেটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জপতপ বা অন্যান্য পুণ্যকর্মের মতো শরীরের ধর্মপালনও অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং খুবই গোপনে ডাঁটো চেহারার উদ্দাম স্বাস্থ্যবতী একটি রাখনি বা রক্ষিতা তাঁকে পুষতে হয়েছিল। আওরতটার নাম কুঁয়ারী, জাতে গাঙ্গাতো অর্থাৎ অচ্ছুৎ। জল-অচল হলেও যুবতী আওরতের রগরগে লোভনীয় দেহ হয়ত সবরকম ছুয়াছুতের বাইরে। অন্ধকারে তাকে বিছানায় তুললে কোনো দোষ লাগে না।

এখন যেখানে রেণ্ডিটুলি, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে সেটা ছিল ফাঁকা পড়তি জমি। জমিটা চৌবেদের। ওখানে ঘর তুলিয়ে কুঁয়ারীর থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন রামসিংহাসন। গভীর রাতে লখিন-পুরায় নিষুতি নামলে সে চলে আসত এই ঘরটায়—এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছেন রামচরিত। ঘরটা একদা কুঁয়ারীর জন্যই বাউণ্ডারি ওয়াল কেটে তৈরি করা হয়েছিল।

তারপর একদিন জাগতিক নিয়মেই কুঁয়ারীর উদ্দাম শরীর ভাঙতে

থাকে, তার সম্বন্ধে রামসিংহাসনের আগ্রহও ফুরিয়ে যায়। ছেঁড়া বাতিল জুতোর মতো তিনি কুঁয়ারীকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কিন্তু রামসিংহাসন তাকে ছাড়লেও পেটের খিদে তাকে ছাড়ে না। কাজেই রাত হলে নিজের ভাঙাচোরা, ধামসানো প্রৌঢ় শরীরটাকে সাজিয়ে কুঁয়ারী তার ঘরের দরজায় দাঁড়াতে শুরু করে। চোখের কোণে ঐ বয়সের পক্ষে যতটা মদিরতা সম্ভব ফুটিয়ে তুলে তাকিয়ে থাকে সামনের রাস্তার দিকে। আস্তে আস্তে তার শরীরেও খদ্দের জুটতে থাকে।

কুঁয়ারী জানত, চল্লিশ বছরের পুরনো ঝাঁঝরা দেহ দিয়ে বেশিদিন লোক টানা যাবে না। আনপড় হলেও মাথাটা তার খুবই পরিষ্কার; ভবিষ্যতের অনেকটা দূর পর্যন্ত সে দেখতে পেত। কুঁয়ারী একটি দুটি ক'রে চমকদার চেহারার ছোকরি জোটাতে শুরু করে। তারাও সন্ধের পর সেজেগুজে তার সঙ্গে দরজার কাছে দাঁড়াতে থাকে।

এইভাবেই লখিনপুরার রেণ্ডিটুলির ফাউণ্ডেসন স্টোন বা ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়।

গোটা দশেক মেয়ে জুটবার পর একদিন রামসিংহাসন কুঁয়ারীকে ডাকিয়ে এনে যা বলেন তা এইরকম। কুঁয়ারীদের ব্যবসা যখন জমে গেছে তখন তাঁর জমিটার ভাড়া দিতে হবে। কুঁয়ারী রাজি হয়ে যায়।

প্রথম দিকে ভাড়া ছিল খুবই কম। ক্রমে মেয়ে যত বাড়তে থাকে, ভাড়াও সেই অনুযায়ী বেড়েই চলে। বাড়তে বাড়তে অঙ্কটা আপাতত হাজারে এসে ঠেকেছে।

গোড়ার দিকে লখিনপুরার মান্যগণ্য লোকজনেরাই রামসিংহাসনের কাছে দরবার করেছিলেন—এই নোংরা পাড়াটা তুলে দিতে হবে। নতুবা লখিনপুরার সর্বনাশ অনিবার্য। রামসিংহাসন তাঁদের বুঝিয়েছিলেন, সোসাইটির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই ওটা থাকা দরকার। তাঁর লজিকটা এই জাতীয়। বাড়িতে নর্দমা থাকাটা যেমন জরুরি, শহরে তেমনি একটা বেশ্যাপাড়ারও একান্ত প্রয়োজন। নইলে ঘরে ঘরে নোংরামি ঢুকে যাবে।

এরপর যতদিন যায়, বেশ্যাদের কলোনি ততই জমজমাট হতে থাকে। এখন রেণ্ডিটুলিতে কম ক'রে চারশো মেয়ে। লখিনপুরার মতো ছোট টাউনে এত বেশ্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর এখান থেকে তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরে তিন চারটে বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স হয়েছে। সেখানকার স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ফুর্তিফার্তার জন্য লখিনপুরার রেণ্ডিটুলি থেকে মেয়ে সাপ্লাই করা হয়। যারা চলে যায় তাদের জায়গায় নতুন মেয়ে আসে। আসলে এটা হল বেশ্যাদের নার্সারি।

রামসিংহাসন ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে নয়, মধ্যরাতে লখিনপুরা ঘুমিয়ে পড়লে জমি ভাড়ার টাকাটা বাউণ্ডারি ওয়ালের এই ছোট ঘরটায় এসে দিয়ে যেতে হবে। এই নিয়মই পুরুষানুক্রমে চালু আছে। রামসিংহাসন এবং রামশরণের সময় যারা টাকা দিয়ে যেত কবেই তারা মরে ফৌত হয়ে গেছে। ইদানীং ক'বছর ধরে আসছে চৌপটলাল।

রামচরিত চৌপটলালের দিক থেকে চোখ সরিয়ে একশো টাকার নোটগুলোর দিকে তাকালেন। দশখানাই আছে। পকেট থেকে শিশি বার ক'রে, ছিপি খুলে নোটগুলোতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে পবিত্র করতে লাগলেন।

চৌপটলাল বলে, 'হুজৌর, নোটগুলো আমি গঙ্গাপানিতে ধুয়ে এনেছি।'

এ খবরটা অজানা নয়। প্রতিবারই চৌপটলাল বিনীতভাবে এটা জানায়। উত্তর না দিয়ে জল ছিটোতেই লাগলেন রামচরিত। একসময় শুদ্ধিকরণের কাজ শেষ হলে নোটগুলো পকেটে পুরে বলেন, 'ঠিক হ্যায়—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। চৌপটলালকে চলে যেতে বলছেন রামচরিত।

কিন্তু বেশ্যার দালালটা ইঙ্গিতটা বুঝেও তক্ষুনি চলে যায় না;

অসীম দুঃসাহসে দাঁড়িয়েই থাকে।

বিরক্তিতে রামচরিতের ভুরু কুঁচকে যায়। কর্কশ গলায় বলেন, 'কী হল ?'

হাতজোড় ক'রে, খুবই বিনীত ভঙ্গিতে ঘাড় নুইয়ে চৌপটলাল বলে, 'একগো বাত সরকার—'

'কী ?'

'রতিয়া আপনাকে 'পরণাম' (প্রণাম) জানিয়েছে।'

মুহূর্তে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যায়। রক্তের ভেতর গরম লু-বাতাসের মতো হু হু ক'রে কী যেন ছুটতে থাকে। নির্বাচন যে প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে এসেছে, তার তলায় রতিয়ার ভাবনাটা এতদিন চাপা পড়ে ছিল। আওরতটার আশ্চর্য মোহময় দেহ অনেকগুলো স্তর ঠেলে কোত্থেকে যেন উঠে এসে চোখের সামনে দুলতে লাগল।

সত্যিই রতিয়া 'পরণাম' জানিয়েছে না এটা চৌপটলালের কোনো চতুর কারসাজি, বুঝবার জন্য সোজা তার দিকে তাকালেন রামচরিত। নরকের পোকাটার মুখ এই মুহূর্তে নিপাট ভালমানুষের মতো। দেখে মনে হয় না, রতিয়ার নামে 'পরণামে'র কথাটা সে বানিয়ে বলেছে।

ভেতরে যে তোলপাড় চলছে, বাইরে তা বেরিয়ে আসতে দেন না রামচরিত। গম্ভীর রূঢ় গলায় বলেন, 'কিসের পরণাম ?'

রামচরিতের মুখচোখ দেখে হয়ত ভয় পেয়ে যায় চৌপটলাল। আরো নুয়ে, কাঁপা জড়ানো গলায় জানায়, সেদিন মন্দিরে রামসীতাজী এবং রামচরিতজীকে 'পরণাম' ক'রে আসার পর রতিয়া যে 'ব্যওসা' শুরু করেছে সেটা রমরম ক'রে চলছে। এই তিনজনের 'কিরপা' না থাকলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে পলকের জন্য মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে যায় রামচরিতের। শিয়াল এবং শকুনের পাল রতিয়ার ঐরকম আশ্চর্য একটা শরীরকে কামড়ে ছিঁড়ে শেষ ক'রে দিচ্ছে। পরক্ষণেই দরজার

দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'নিকাল যা, নিকাল যা—'

চৌপটলাল চমকে ওঠে। তারপর দ্রুত দরজার নিচু ফ্রেমের ভেতর দিয়ে শরীরটা গলিয়ে মুহূর্তে বাইরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর নিজের শোবার ঘরে ফিরে এসে রামচরিত দেখতে পান, সেই চড়া আলো দু'টো জ্বলছেই। আর মশারির ভেতর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন গোমতী।

চোখের সামনে রতিয়ার দেহটা ভাসছিল। মনে মনে স্ত্রীর পাশে তাকে দাঁড় করাতেই, শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে রামচরিতের। শুচিবাইগ্রস্ত সতীসাধ্বী গোমতীকে জীবনে এই প্রথম খুন করতে ইচ্ছা হয় তাঁর।

ঘুমের মধ্যেই গোমতী টের পান, রামচরিত ফিরে এসেছেন। জড়ানো গলায় বলেন, 'গঙ্গাপানি দিয়ে রুপাইয়া শুধ্ ক'রে এনেছ?'

হিংস্র চাপা গলায় রামচরিত উত্তর দেন, 'হ্যাঁ—'

'রাত হয়েছে অনেক। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়।'

শোবার পরও বহুক্ষণ ঘুম আসে না রামচরিতের। যতই রতিয়ার কথা ভাবেন, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। নাকমুখ এবং কান দিয়ে অনবরত গরম ভাপ বেরুতে থাকে।



অগ্রাণ মাস পড়ে গেল।

রামচরিতের হাজার বিঘা জমির সমস্ত ধানই পেকে গেছে। এখন ফসল কাটার মরসুম।

যদিও জমিজমার কাজ দেখার জন্য প্রচুর নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী লোকজন আছে তবু ধান কাটাইয়ের সময় রোজই একবার ক'রে ক্ষেতিতে গিয়ে দেখাশোনা ক'রে আসেন রামচরিত। কিন্তু এবার চুনাওর কারণে একেবারেই সময় পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু কি ক্ষেতিতেই যেতে পারছেন না তিনি, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পারলৌকিক সুখের আশায় এবং পবিত্র চতুর্বেদী বংশে পুনর্জন্মের জন্য যে পুণ্যকর্মগুলি তিনি ক'রে থাকেন, সে সব অত্যন্ত সংক্ষেপে সারতে হচ্ছে। দু ঘণ্টার মধ্যে রামসীতা এবং কুলদেওতা শিউশঙ্করকে প্রণাম, পাখি এবং রাস্তার অনাথ বেওয়ারিশ কুকুর আর ষাঁড়দের ভোজন করানো, ইত্যাদি কাজ চুকিয়ে ফেলতে হয়। বাড়ির পোষা গরু, ঘোড়া এবং হাতীগুলোকে আদর বা দানা খাওয়ানোর ফুরসতটুকুও এখন আর নেই। তাঁকে দেখলেই হাতী ঘোড়াগুলো চিৎকার জুড়ে দেয়। রামচরিত ভরসা দেন, 'ক'টা দিন সবুর কর, চুনাওটা যাক। তারপর কত আদর করি, দেখিস।'

নির্বাচনের তারিখ ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। এখন সকাল-বিকেল দু'বার পদযাত্রা এবং জনসংযোগের জন্য বেরুতে হচ্ছে

রামচরিতকে। তাছাড়া দু'চারদিন পর পর মীটিং তো আছেই।

নির্বাচনী প্রচারে এই যে অস্বাভাবিক জোরটা দেওয়া হচ্ছে, তার কারণ ধরতীলাল। সে-ও সারাদিন অচ্ছুৎটুলির মুরুব্বিদের নিয়ে লখিনপুরার বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে দু দু'বার পাটনা এবং দিল্লী থেকে দু'জন নাম-করা হরিজন নেতাকে এনে বিরাট মীটিংও করেছে। খ্রীস্টান পাড়া মুসলমান পাড়া আর অচ্ছুৎটুলি উজাড় ক'রে সবাই সেখানে গিয়ে জমা হয়েছিল। এমন কি কৌতূহলের বশে উচ্চবর্ণের বামহন-কায়াথদের অনেকেই দুই মীটিংয়ে বক্তৃতা শুনতে যায়। নেতাদের ভাষণ শুনে তারা রীতিমত অভিভূত। কেউ কেউ নাকি এমনও বলছে, অচ্ছুৎ আর মাইনোরিটিদের ওপর বহুকাল অবিচার করা হয়েছে, এটা অন্যায়। ছুয়াছুত, উচ্চবর্ণের গোঁড়ামি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বদলানো দরকার।

ফলে ক্রমশ রামচরিতের জেতার ব্যাপারটা বেশ অনিশ্চিতই হয়ে পড়ছে। প্রথম দিকে মনপসন্দরা তুড়ি মেরে ধরতীলালকে হারাবার কথা বলতেন। আজকাল আর সে গ্যারান্টি কেউ দিতে পারছে না।

রাজগৃহ তেওয়ারী উত্তেজিত ভঙ্গিতে একদিন বলেছিলেন, একটা চরম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কোনোভাবেই ধরতীলালকে মীটিং করতে দেওয়া হবে না। তেমন বুঝলে লোক লাগিয়ে ভূচ্চরের ছৌয়াটাকে এমনভাবে জখম করা হবে যাতে ছ'মাস হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয়। অচ্ছুৎ, মুসলমান এবং খ্রীস্টানদের শাসানো হবে, ধরতীলালকে ভোট দিলে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু এই সব দামী দামী পরিকল্পনা এক কথায় নাকচ ক'রে দেন জগৎনারায়ণ। তিনি ধীর স্থির কৌশলী ; কোনো কারণেই উত্তেজিত হন না। তাঁর মস্তিষ্ক ফিউডাল সিস্টেমের উগ্র বারুদে ঠাসা নয়। জগৎনারায়ণ বুঝিয়ে বলেন, ধরতীলালের গায়ে হাত দেওয়া বা তার মীটিং ভাঙতে যাওয়া হবে মারাত্মক বোকামি। সর্বভারতীয় হরিজন নেতারা এখানে আসছেন, মীটিং করছেন, দু-একদিন থেকে ধরতীলালের

সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন। হঠকারিতার বশে ওসব করলে সারা দেশ জুড়ে তাঁরা গোলমাল শুরু করবেন। তাতে রামচরিত ক্ষতিগ্রস্তই হবেন।

তাই নির্বাচনী প্রচারের ওপর ক'দিন ধরে অস্বাভাবিক জোর দেওয়া হয়েছে।

আজ সকালে পরকালের কাজগুলো দ্রুত শেষ ক'রে, মনপসন্দদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রামচরিত। সাত আটজন চুনাও-কর্মীও তাঁদের সঙ্গে চলল। এদের দু'জনের পিঠে চারটে ক'রে গঙ্গাজলের বোতল দড়ি দিয়ে বাঁধা। আজ রামচরিতরা যাবেন অচ্ছুৎটুলিতে। গঙ্গাজল সেই কারণেই দরকার।

লখিনপুরার শেষ মাথায় অচ্ছুৎটুলির কাছে এসে পৌঁছতে বেশ রোদ উঠে গেছে—শীতের ম্যাড়মেড়ে নিরুত্তাপ রোদ। উত্তুরে হাওয়া সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। হাওয়াটা এতই ঠাণ্ডা, মনে হয় হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে।

দুই চুনাও-কর্মীকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রাখা হয়েছিল। অচ্ছুৎটুলির মুখ থেকেই গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে তারা প্রথমে ভেতরে ঢোকে। আর সমানে চেঁচাতে থাকে, 'সবাই বেরিয়ে এসো, বড়ে সরকার রামচরিতজী এসেছেন।'

আগে থেকে জানিয়ে আসেন নি রামচরিতরা। তবু গোটা অচ্ছুৎটুলিতে সাড়া পড়ে যায়।

এখানে প্রথমেই পড়ে দোসাদপাড়া, তারপর থেকে পর পর গাঙ্গাতোপাড়া ধাঙড়পাড়া কোয়েরিপাড়া। রামচরিতের নাম শুনে সব ঘর থেকেই ঊর্ধ্বশ্বাসে লোকজন বেরিয়ে আসে।

এদিকে গঙ্গাজলে-ধোয়া পবিত্র মাটির ওপর দিয়ে অচ্ছুৎটুলির ভেতরে চলে আসেন রামচরিত এবং তাঁর সঙ্গীরা। রাস্তার দিকটা সরু এবং চাপা হলেও ভেতরে ঢুকলেই বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

সেখানে এর মধ্যে ভিড় জমে গেছে। ওদের সামনে রয়েছে বুড়ো মুনেশ্বর। সে জাতে গাঙ্গাতো হলেও গোটা অচ্ছুৎটুলির মুরুব্বি এবং এখানকার 'পঞ্চ'-এর মাথা।

রামচরিত আর তাঁর সঙ্গে এতগুলো 'সরগণা আদমী'কে (মান্যগণ্য ব্যক্তি) দেখে অচ্ছুৎটুলির লোকজনেরা এতই অবাক হয়ে গেছে যে কী বলবে, কী করবে, ঠিক করতে পারছে না। রামচরিতের মতো মানুষ কস্মিনকালেও যে তাদের পাড়ায় আসবেন, কে ভাবতে পেরেছিল! আকাশ থেকে এই মুহূর্তে সূর্য খসে পড়লেও ওরা এতটা অবাক হতো না।

রামচরিত অচ্ছুৎটুলির বেশির ভাগ লোকজনকেই চেনেন ; কেননা এদের অনেকেই তাঁর জমিতে এবং লাজপতিয়া গাঁয়ের খামারে কাজ করে। তিনি সবাইকে তো দেখছিলেনই ; তবে ভিড়ের ভেতর তাঁর চোখ ধরতীলালকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু ধরতীলালকে কোথাও দেখা গেল না। সে কি তাদের ঘরে বসে আছে? না কোথাও বেরিয়ে গেছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্গে ভোট ভাঙাতে আসাটা খুবই অস্বস্তির ব্যাপার, বিশেষ ক'রে সে যদি সামনে বা কাছাকাছি কোথাও থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রাজগৃহ তেওয়ারিও অচ্ছুৎটুলির সবাইকে চেনেন। স্তব্ধতা ভেঙে তিনিই প্রথম শুরু করেন, 'মুনেশ্বর, তোমাদের কাছে একটা খুব জরুরি কাজে আমরা এসেছি।'

এতক্ষণে বিহ্বলতা কাটে মুনেশ্বরের। ভিড়ের উদ্দেশে চিৎকার ক'রে বলে, 'বড়ে সরকার আয়া। পরণাম কর—' বলে আবহমান কালের যান্ত্রিক নিয়মে মাটিতে মাথা ঠেকায়। তার দেখাদেখি অন্য সবাই একই ভাবে প্রণাম করে।

একটু পর উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে মুনেশ্বর জানায়, অচ্ছুৎটুলির মতো নোংরা জায়গায় 'এত্তে বড়ে বড়ে আদমী'র বিশেষ ক'রে স্বয়ং বড়ে সরকার রামচরিতজীর আসা ঠিক হয় নি। হুকুম

করলে নৌকরেরা অর্থাৎ মুনেশ্বররাই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করত। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কাছে কী জরুরত হুজৌর?'

রাজগৃহ উত্তর দেবার আগে জগৎনারায়ণ বলেন, 'আমি বলছি।' তিনি চমৎকার কথা বলেন। এখানে আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে জানিয়ে জগৎনারায়ণ বলতে থাকেন, 'রামচরিতজীকে তোমরা কতকাল ধরে দেখে আসছ! তোমাদের বাপ-নানারা তাঁদের জমিনে কাজ করেছে, এখন তোমরা করছ, এরপর তোমাদের ছেলেমেয়েরা করবে। চৌবেজীদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি আজকের! তোমরা রামচরিতজীর ভাই, বন্ধু, সুখদুখ আউর জনম জনমকা সাথী—সত্যিকারের আপনা আদমী। তোমরা গরীব, তোমাদের এখানে জলের বড় তখলিফ, রোগ হলে হাসপাতাল নেই। এ সব দেখেশুনে খুবই কষ্ট পান রামচরিতজী। লেকেন এম-এল-এ না হলে, মিনিস্টার না হলে কিছুই তো করা যায় না। অনেক ভাবনা-চিন্তা ক'রে শেষ পর্যন্ত তিনি চুনাওতে নেমেছেন —স্রেফ তোমাদের ভালাইর কথা ভেবে। নইলে এ সব ঝামেলার মধ্যে কে আর যেতে চায়! আমরা অনেক মানা করেছি। লেকেন তোমাদের কথা ভেবে রামচরিতজীর চোখে ঘুম নেই। শুধু বলেন, আমি আর ক'দিন! মরার আগে মুনেশ্বরদের জন্যে কিছু করতেই হবে। ওরা আমার আপনা আদমী। রামচরিতজী চুনাওতে জিতলে দো মহিনার ভেতর এখানে 'পাক্কী' (পাকা রাস্তা) হবে, হাসপাতাল বসবে, স্কুল বসবে, কারখানা হবে, নতুন কুয়া কাটানো হবে। তাই এত বড় আদমী রামচরিতজী তোমাদের কাছে ছুটে এসেছেন। এখন উনি কিছু বলবেন; মন দিয়ে শোন।'

রামচরিত মনপসন্দ রাজগৃহ—সবাই চমৎকৃত। কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে রামচরিত চুনাওতে নেমেছেন সেটা ওঁরা ভালোই জানেন। কিন্তু অচ্ছুৎটুলিতে এসে ভোট টানার জন্য জগৎনারায়ণ তার যা নতুন ব্যাখ্যা দিলেন তা শুনে ওঁদের তাক লেগে গেছে।

এদিকে অচ্ছুৎরাও খুবই অভিভূত। মুনেশ্বর কৃতজ্ঞ স্বরে বলেন,

'বড়ে সরকারকা বহোত কিরপা।'

রামচরিত্র এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার এইভাবে শুরু করেন, 'এখন তোমাদের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে মুনেশ্বর। তোমরা ভোট দিলে জিততে পারি।' বলতে বলতে পেশাদার ভোট প্রার্থীদের মতো হাতজোড় করেন। এই ব্যাপারে আগে থেকেই তাঁকে তালিম দিয়ে রেখেছিলেন জগৎনারায়ণ।

হঠাৎ শিউরে উঠে, জিভ কেটে গলার ভেতর হিক্কার মতো শব্দ করে মুনেশ্বর। বলে, 'আমাদের মতো জানবরদের কাছে হাত জুড়বেন না সরকার। ভগোয়ান রামজীর কিরপায় জরুর আপনি জিতে যাবেন।'

জগৎনারায়ণ তার কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'রামজীর কিরপা তো আছেই, তোমাদের কিরপা পাব তো?'

মুনেশ্বর চমকে উঠে বলে, 'এরকম কথা আমাদের শুনতে নেই ডাগদরসাব। আমরা গরীব ছোটা আদমী; দুনিয়ার সবার জুতির তলায় থাকি। আমরা কিরপা করব বড়ে সরকারকে! হো ভগোয়ান, এ সবও শুনতে হল!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিরপা করতে হবে না। তোমরা ভোটটা দিচ্ছ তো?'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে মুনেশ্বর। তারপর জানায়, এ বিষয়ে এখন সে কিছুই বলতে পারবে না, কারণ তার একার কথায় অচ্ছুৎটুলির কেউ ভোট দেবে বলে মনে হয় না। সবার সঙ্গে এ নিয়ে 'বাতচিত' করলে বোঝা যাবে এখানকার লোকজনেরা রামচরিতের নামে মোহর মারবে কিনা!

জগৎনারায়ণ বলেন, 'বড়ে সরকার খুদ তোমাদের কাছ এসেছেন। দুনিয়ায় তাঁর চেয়ে 'আপনা আদমী' তোমাদের আর কেউ নেই। সবাইকে বুঝিও রামচরিতজী চুনাওতে জিতলে তাদের সব চাইতে বেশি 'ভালাই' হবে।'

'বোঝাব হুজৌর।'

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে ধরতীলালের নাম একবারও কেউ করেন নি। না রামচরিত, না জগৎনারায়ণ। এমন কি মুনেশ্বরও নয়।

রামচরিত বলেন, 'চলি মুনেশ্বর। আমার কথাটা মনে রেখো।' বলে আর দাঁড়ান না ; সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে চলেন।

ভোট সম্পর্কে গ্যারান্টি না দিলেও, ভক্তিটা কিন্তু যথেষ্টই দেখায় মুনেশ্বররা। হাতজোড় করেই বাইরের রাস্তা পর্যন্ত রামচরিতদের এগিয়ে দিয়ে যায়।

খানিকটা চলার পর রামচরিত জিজ্ঞেস করেন, 'কী মনে হল আপনাদের, অচ্ছুৎদের ভোট পাওয়া যাবে ?'

রাজগৃহ বলেন, 'মুনেশ্বরের কাছ থেকে তো কথা আদায় করা গেল না। মনে হচ্ছে, ওরা নিজেদের ভেতর পরামর্শ ক'রে কাকে ভোট দেবে, ঠিক ক'রে রেখেছে। অচ্ছুৎ ভোটের আশা আমাদের না রাখাই ভালো।'

বিষ্ণুকান্ত হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন। জগৎনারায়ণের দিকে ফিরে বলেন, 'আপনার কথামতো ভালমানুষি ক'রে জানবরগুলোর কাছে ভোট চাইতে আসা ঠিক হয় নি।'

জগৎনারায়ণ চোখ কুঁচকে তাকান, 'কী করলে ঠিক হতো বিষ্ণুকান্তজী ?'

চড়া গলায় বিষ্ণুকান্ত বলেন, 'ওদের ডেকে পাঠিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা—হয় ভোট দিবি, নয় জানে শেষ হয়ে যাবি।'

এ সব আলোচনা আগেই হয়ে গেছে। নাকের ভেতর অদ্ভুত শব্দ ক'রে জগৎনারায়ণ বলেন, 'আপনি সেই পুরানা জমানাতেই রয়ে গেলেন বিষ্ণুকান্তজী। মোটা দাগের ফিউডাল মেথড অচল হয়ে যাচ্ছে। ট্যাকটিসটা সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। খুনজখমের রাস্তা নিলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।' একটু থেমে বলেন, 'আমাদের আসল মোটিভটা

কী ? রামচরিতজীকে জেতানো। প্রয়োজন হলে আবার অচ্ছুৎটুলিতে আসতে হবে। একবার না, বার বার—'

বিষ্ণুকান্ত নিজের পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে দু হাতের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেন, 'কিছু হবে না। একটা ভোটও পাওয়া যাবে না। মাঝখান থেকে জানোয়ারগুলোকে আশকারা দিয়ে মাথায় তোলা হবে। পায়ের জুতিকে মাথায় চড়ানো ঠিক নয়।'

যদুনন্দন মোটামুটি মধ্যপন্থী। উত্তেজনা ঝঞ্ঝাট, এসব পছন্দ করেন না। আপসের সুরে বলেন, 'জগৎনারায়ণজীর কথামতো চলে দেখাই যাক না কী দাঁড়ায় !'

বিষ্ণুকান্ত বলেন, 'কিছুই দাঁড়াবে না। একটা কথা জানিয়ে রাখি, অচ্ছুৎরা ভোট না দিলে ওদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে ইণ্ডিয়ায় যতদিন ডেমোক্রেসি চালু আছে ততদিন যেন না ভোলে।'



অচ্ছুৎটুলি থেকে বেরিয়ে, কথা বলতে বলতে কখন যে সবাই লখিনপুরার শেষ মাথায় নিষিদ্ধ পাড়া অর্থাৎ রেণ্ডিটুলির কাছে চলে এসেছিলেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ মনপসন্দের চোখে পড়তে তিনি প্রায় আঁতকে ওঠেন। দম-আটকানো গলায় বলেন, 'এ কোথায় এসেছি আমরা! ফিরে চলুন, ফিরে চলুন—'

বাকি সবাই চমকে একবার রেণ্ডিটুলিটার দিকে তাকান। মনপসন্দের মতোই রুদ্ধশ্বাসে বলেন, 'কী ক'রে যে এই নরকের দরজায় চলে এলাম! আর এক সেকেণ্ডও এখানে নয়—' বলতে বলতে লম্বা পায়ে দৌড়তে শুরু করেন আর দৌড়তে দৌড়তেই মুখে রুমাল ঠেসে ধরেন। এখানকার বাতাসে যেন পাপের বীজাণু থিক থিক করছে, নাক মুখের ছিদ্র দিয়ে গলগল ক'রে সেগুলো ভেতরে ঢুকে পাছে পবিত্র হার্ট লাংসকে নোংরা ক'রে ফেলে তাই রুমাল চেপে ধরা।

জগৎনারায়ণ অন্য সবার সঙ্গে খানিকটা দৌড়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর মাথায় দ্রুত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চিৎকার ক'রে বলেন, 'ছুটবেন না, ছুটবেন না। রুখ যাইয়ে।'

সবাই থেমে যান। জগৎনারায়ণ তাঁদের কাছে এসে বলেন, 'খেয়াল না ক'রে যখন এসেই পড়েছি তখন 'ফায়দা' ওঠাবার ব্যবস্থা ক'রে যাই।'

'এখানে আবার কিসের ফায়দা?

'ভেবে দেখুন না—' রহস্যময় হাসেন জগৎনারায়ণ।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন সবাই। কারো মাথায় কিছু ঢুকছে না।

জগৎনারায়ণ বলেন, 'প্রস্টিটিউটদের ভোট আছে না?'

একজন চুনাও-কর্মীর কাছে এখানকার বিভিন্ন এলাকার আলাদা আলাদা ভোটার্স লিস্ট থাকে। তাকে ডেকে জগৎনারায়ণ জানতে চান, রেণ্ডিটুলির সবসুদ্ধ কত ভোট আছে।

চুনাও-কর্মীটির নাম জগনাথ। সে বলে, 'চারশো পন্দ্র ডাগদর সাব।'

'ঠিক আছে—' বলে রামচরিতের দিকে তাকান জগৎনারায়ণ, 'চলুন রামচরিতজী, ছোকরিগুলোকে ভোট দেবার কথা বলে আসি।'

পদযাত্রা বা বাড়ি ঘুরে জনসংযোগের মূল পরিকল্পনায় বেশ্যাপাড়ায় আসার কথা ছিল না। ব্যাপারটা আগে মাথায় আসে নি জগৎনারায়ণের। এই মুহূর্তে নেহাতই যখন তাঁরা রেণ্ডিটুলির কাছাকাছি চলে এসেছেন এবং নির্বাচনে রামচরিতের জেতাটা রীতিমতো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তখন চারশো পনেরটা ভোট ছেড়ে দেওয়া যায় না।

এদিকে নিজেদের অজান্তে এখানে আসার পর থেকেই ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন রামচরিত। নির্বাচন, ভোট, রেণ্ডিটুলির বাতাসে পাপের বিষাক্ত বীজাণু, ইত্যাদি ছাপিয়ে রতিয়ার দুর্ধর্ষ উত্তেজক দেহটা তাঁর চোখের সামনে অনবরত ভেসে উঠছে। মনপসন্দদের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছিলেন ঠিকই, রতিয়ার শরীর কিন্তু তাঁর রক্তে তীব্র ঝাঁজ ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

রামচরিত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রাজগৃহ গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কী বলছেন জগৎনারায়ণজী! রামচরিতজী ঐ পাপী নোংরা আওরতগুলোর কাছে ভোট চাইতে যাবেন!'

জগৎনারায়ণের মুখ শান্ত, উত্তেজনাশূন্য। হেসে হেসে বলেন, 'ডেমোক্রেসি আর চুনাও যতদিন চালু আছে, ততদিন সবার কাছেই যেতে হবে তিওয়ারিজী। ওদের বেশ্যা বলে ভাবছেন কেন? মনকে নিরাসক্ত ক'রে দেখুন, ওরা এক একজন এক-একটা ভোট।'

একনাগাড়ে আরো অনেক কিছু বলে যান জগৎনারায়ণ। চুনাওর দিক থেকে একটা বেশ্যার ভোটও যা, মঠের শুদ্ধাত্মা সন্ন্যাসীর ভোটও তা-ই। বেশ্যার ভোট বলে তার দাম কানাকড়িও কম নয়। নির্বাচনী সিস্টেম এদেশে চোর-ডাকাত-সাধু-ব্রহ্মচারী-বেশ্যা-নারীধর্ষক সবাইকে সমান, 'বরাবর' ক'রে দিয়েছে। তা ছাড়া রেণ্ডিটুলিতে একটা দুটো ভোট নয়, মোট চারশো পনেরটা ভোট রয়েছে। এদের উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কে বলতে পারে, হয়ত বেশ্যাদের ভোটের জোরেই শেষ পর্যন্ত রামচরিত জিতে যাবেন।

জগৎনারায়ণের এ জাতীয় নিরাসক্ত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও মনপসন্দরা রে রে ক'রে নিশ্চয়ই আপত্তি জানাতেন কিন্তু রামচরিতই হঠাৎ ভীষণ লিবারাল হয়ে যান। বলেন, 'জগৎনারায়ণজী ঠিকই বলেছেন। এতগুলো ভোট ছেড়ে দেওয়া যায় না। দো-চার মিনিটের জন্যে গিয়ে একবার প্রস্টিটিউটদের বলে আসব—এই তো! অচ্ছুৎটুলিতে যে কাপড় টাপড় পরে গিয়েছিলাম তা তো ফেলেই দিতে হবে। তার আগে না হয় এখানকার কাজটা চুকিয়ে যাই।' একটু থেমে সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে করতে ফের বলেন, 'চুনাওতে যখন আপনারা আমাকে নামিয়েছেন তখন সবার কাছে তো যেতেই হবে।'

আসলে সেদিন ভোরে রামসীতা মন্দিরের সামনে একবারই মাত্র রতিয়াকে দেখেছিলেন রামচরিত। সেই একবারেই আওরতটার দৃঢ় মাংসল স্তন, পাতলা কোমর, গভীর নাভি, তাজা চকচকে শরীরের চামড়া, আশ্চর্য 'যাদুভরি' চোখ, পাতলা জেলজেলে শাড়ির তলায় ভারী উরুর আভাস, ধবধবে ঘোড়ের মতো কাঁধ থেকে নেমে আসা সটান হাত, ভেজা ভেজা সামান্য পুরু ঠোঁট—সব কিছু তাঁর মাথায়

স্থায়ীভাবে বসে গেছে।

স্ত্রীর মারাত্মক শুচিবাই, রামসীতা এবং কুলদেওতা শিউশঙ্করকে প্রণাম, পাখিদের দানা খাওয়ানো, রাস্তার বেওয়ারিশ অনাথ ষাড় কুকুর এবং গাধাদের ভোজন করানো, জমিজমার তদারকি, ইত্যাদি ঐহিক এবং পারলৌকিক অভ্যাসগুলোর মধ্যে জীবন যখন পোষ মেনে গেছে সেই সময় এই প্রৌঢ় বয়সে রামচরিতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো প্রচণ্ড উত্তেজক ব্যাপার—চুনাও এবং রতিয়া। চুনাওর কারণে অনবরত এতদিকে দৌড়তে হচ্ছে যে রতিয়ার কথা ভালো ক'রে ভাবতেই পারছেন না। তবে গোমতীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই রতিয়াকে মনে পড়ে। আর তখনই রক্তের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে যায়। পঞ্চান্ন বছরের ঝিমিয়ে আসা রক্ত আচমকা ফেনিয়ে উঠে প্রচণ্ড গতিতে শিরা-উপশিরায় ছুটতে থাকে।

সোসাইটির যে চূড়ায় রামচরিত বসে আছেন, লখিনপুরার মানুষের মনে চতুর্বেদী বংশের যে ইমেজ, তাতে তাঁর পক্ষে সজ্ঞানে প্রকাশ্য দিবালোকে রেণ্ডিটুলিতে ঢোকা অসম্ভব। অবশ্য চৌপট-লালকে একটু ইঙ্গিত দিলেই বাড়ির পেছন দিকে বাউণ্ডারি ওয়ালের গায়ের সেই ছোট্ট ঘরটায় মাঝরাতে রতিয়াকে সে হাজির ক'রে দেবে। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে যা ভাবা যায়, ঠিক ততটাই কি করা যায়? অন্তত এখনও পর্যন্ত তা পেরে ওঠেন নি রামচরিত। তা ছাড়া চুনাওর মুখে এসব করতে যাওয়া ভয়ানক হঠকারিতা। একবার জানাজানি হয়ে গেলে ধরতীলালরা তা পুরোপুরি কাজে লাগাবে। এখন তাঁকে চোখকান খোলা রেখে খুবই সতর্ক ভঙ্গিতে এগুতে হবে।

শুধুমাত্র রতিয়াকে দেখার জন্য কোনোদিনই রেণ্ডিটুলিতে যেতে পারতেন না রামচরিত। চুনাও এ ব্যাপারটা খুবই সহজ ক'রে দিয়েছে। নির্বাচনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে যায়।

এদিকে রামচরিতের সায় পেয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন জগৎনারায়ণ। জগনাথকে বলেন, 'আওরতদের পাড়ায় গিয়ে খবর

দাও রামচরিতজী আসছেন। ওরা যেন সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়।'

জগনাথ চলে গেলে সেই চুনাও-কর্মীটিকে—যার গলায় গঙ্গাজলের শিশি বোতল ঝুলছে—ডেকে জগৎনারায়ণ বলেন, 'গঙ্গাপানি ছিটিয়ে রেণ্ডিটুলিতে ঢোকার রাস্তাটা শুধ্ ক'রে ফেল। রামচরিতজী যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই পর্যন্ত ছিটোবে।'

দুই চুনাও-কর্মী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ওরা জানায়, বেশ্যাপাড়ায় ঢোকার পথ পবিত্র ক'রে ফেলা হয়েছে এবং আওরতগুলো ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গায় রামচরিতের জন্য অপেক্ষা করছে।

জগৎনারায়ণ বলেন, 'চলুন, যাওয়া যাক—' বলে আগে নিজে এগিয়ে যান।

তাঁর পেছনে রামচরিত এবং চুনাও-কর্মীরা যেতে থাকে। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাকে মুখে রুমাল ঠেসে সবার শেষে যান রাজগৃহরা। স্বয়ং রামচরিতের যেখানে আপত্তি নেই সেখানে তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কী যায় আসে। তবু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওঁরা খুবই বিরক্ত; ঘৃণায় ওঁদের মুখের চামড়া বার বার কুঁচকে যাচ্ছে।

রেণ্ডিটুলিটা যে কতটা বড় বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ভেতরে পা দিলেই চোখ পড়ে একটা বিরাট চৌকো ফাঁকা জায়গা ঘিরে টিনের চালের অগুনতি দম-চাপা ঘর। ঘরগুলো গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি ঘরের দাওয়ায় হয় শাড়ি শুকোচ্ছে, নয় তো উনুন জ্বলছে। দাওয়াতেই এখানকার বাসিন্দাদের রান্নার ব্যবস্থা। কারো কারো দাওয়ার কোণে পাখির খাঁচা ঝুলছে। সেগুলোর ভেতর মুনিয়া তোতা কোয়েল বা কাকাতুয়া। ফাঁকা জায়গাটার একধারে ছোট শিবমন্দির।

ঘরের ভেতর বা বাইরের বারান্দায় এখন কেউ নেই। রান্নাবান্না বা অন্যান্য কাজটাজ ফেলে চারশো পনেরটা আওরত মাঝখানের ফাঁকা

জায়গাটায় হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রামচরিত এবং তাঁর সঙ্গীদের দেখামাত্র তারা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। তাদের চোখেমুখে ভয়, বিস্ময়। বোঝা যায়, সবাই হকচকিয়ে গেছে।

ভিড়টার একেবারে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সী একটা আওরত। তার নাম মাদারী। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কুঁয়ারী যেমন ছিল এই বেশ্যা কলোনির 'মাসি' বা সর্বময় কর্ত্রী, এখন মাদারীও ঠিক তা-ই। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌপটলাল।

মাদারীর মাংসল ভারী শরীর, মাথার চুল কাঁচাপাকা, গোল মুখ, তামাটে রং, হাতে চাঁদির মোটা কাংনা, গলায় চাঁদিরই চওড়া হার, হাতে চার-পাঁচটা আংটি, পায়ের আঙুলে চুটকি। তার কপালে এবং থুতনিতে উল্কি। মেয়েমানুষটার দু চোখে ছুরির ধার।

রামচরিত জানেন, এই রেণ্ডিটুলির মাপ চার বিঘে সতের কাঠা আট ধুর। পুরুষানুক্রমে, প্রায় একশো বছর ধরে এ জমিটা তাঁদেরই। কিন্তু রেণ্ডিটুলি বসার পর চৌবে বংশের কেউ এখনকার অশুদ্ধ মাটি মাড়াতে আসেন নি। একশো বছরের মধ্যে রামচরিতই প্রথম এলেন। সেদিক থেকে তাঁদের পরিবারে এ এক দুর্দান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা।

রামচরিত কিন্তু চারপাশের সারিবদ্ধ ঘর, শিবমন্দির বা অন্য কোনো দৃশ্য-টৃশ্য দেখছিলেন না। ভিড়ের ভেতর তাঁর অস্থির চোখ একটি মেয়েমানুষকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ডান ধারে ভিড়ের শেষ মাথায় তাকে পাওয়া গেল ; হৃদ্‌পিণ্ড মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই প্রবল বেগে ধকধক করতে লাগল। বুকের ভেতরকার সেই শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছেন রামচরিত। মারাত্মক নেশা করলে যেমন হয়, মাথার ভেতরটা তেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে।

প্রথম দিন রামচরিত যেমন দেখেছিলেন অবিকল সেই রকমই রয়েছে রতিয়া—তেমনই অটুট তাজা, তেমনই উত্তেজক ও মোহময়। চৌপটলাল জানিয়েছে 'ব্যওসা' শুরু ক'রে দিয়েছে রতিয়া, কিন্তু তার শরীরে সে ছাপ কোথাও নেই।

রামচরিত ভাবলেন, এই কদর্য রেণ্ডিটুলিতে শিয়াল এবং শকুনের পাল রতিয়ার আশ্চর্য শরীর ছিঁড়ে কামড়ে শেষ করুক, এটা কোনোমতে হতে দেওয়া যায় না।

এদিকে মাদারী বলে যাচ্ছিল, 'খুদ ভগোয়ানের পা পড়ল এখানে। এই নরক শুধ্ হয়ে গেল।'

রামচরিতের ডান পাশ থেকে জগৎনারায়ণ এবার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে বলেন, 'আমরা কিন্তু অনেক আশা নিয়ে এসেছি। চুনাওর দিন রামচরিতজীর নামে তোমরা মোহর মারবে তো?'

'জরুর—' মাদারী জানায়, স্বয়ং রামচরিতজী যখন এই নরক পর্যন্ত এসেছেন তখন তাঁকে ভোট দিয়ে এই জঘন্য ঘৃণ্য জীবনের গ্লানি এবং পাপ থেকে কিছুটা অন্তত মুক্ত হতে পারবে।

চৌপটলাল বলে, 'চারশো পন্দ্রটা ভোট আছে এখানে। বড়ে সরকার সবগুলোই পাবেন।'

রাজগৃহরা কেউ কিছু বলছিলেন না। মুখে রুমাল চেপে তাঁরা চনমন ক'রে অগুণতি সুলভ মেয়েমানুষ দেখছিলেন। এখন আর ঘৃণা বা বিরক্তির ভাবটা নেই। লোভে তাঁদের চোখের তারা চকচক করতে থাকে।

জগৎনারায়ণ রামচরিতকে বলেন, 'ওদের কিছু বলুন চৌবেজী।'

রামচরিত পলকহীন রতিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চমকে উঠে হাতজোড় ক'রে বলেন, 'ভগোয়ান তোমাদের ভালো করবেন।'

কিছুক্ষণ পর ওঁরা কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

সবাই, বিশেষ ক'রে জগৎনারায়ণ খুবই খুশী এবং উত্তেজিত। চারশো পনেরটা সলিড ভোটের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অচ্ছুৎরা কথা না দিলেও বেশ্যারা দিয়েছে। আজকের পদযাত্রা এবং জনসংযোগের জন্য বেরিয়ে সেটুকুই লাভ। ঘন মেঘের পাশে সিলভার লাইনিং, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামচরিত কিছুই প্রায় শুনছিলেন না। নেশাচ্ছন্নের মতো হেঁটে যাচ্ছিলেন।

রেণ্ডিটুলির মুখ থেকে ওঁরা সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, কাছাকাছি কোত্থেকে যেন একটা খুবই চেনা গলা ভেসে আসে :

'ভোটমাঙোয়া ভিখমাঙোয়া—
রেণ্ডিটুলিমে আ গিয়া।'

নাকের ভেতর থেকে অদ্ভুত টানা সুর বার ক'রে কেউ গাইছে। দোল-খাওয়া এই সুরটার মধ্যে রয়েছে চাবুক হাঁকানোর মতো তীব্র ব্যঙ্গ।

চমকে রামচরিত এধারে ওধারে তাকাতেই বাঁ দিকে তাঁর চোখ আটকে যায়। রাস্তার ধারের একটা ঝাঁকড়া পীপর গাছের দো-ডালায় বসে আছে 'ফলুটবালা' ঠাণ্ডিলাল। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই বেজন্মার দলটাকেও দেখা গেল। আশেপাশের ডালগুলোতে তারাও পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে।

এখানে আসার আগে নানা ধরনের উত্তেজনায় ঠাণ্ডিলালের কথা একবারও মনে পড়ে নি রামচরিতের। তা ছাড়া পদযাত্রায় বেরিয়ে রাস্তায় ক'দিন তাকে দেখতেও পাওয়া যায় নি। আসলে ঠাণ্ডিলালের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভূচ্চরের ছোঁয়াটা কিছুতেই তাঁকে ভুলতে দেবে না। আগেও যেমন হয়েছে, তেমনি মুখ শক্ত হয়ে ওঠে রামচরিতের ; চোখের তারা থেকে আগুন ঠিকরোতে থাকে।

যদুনন্দন পাশ থেকে হাল্কা গলায় বলেন, 'পাগল কাঁহিকা!'

নৌটঙ্কীর দল থেকে বাতিল-হওয়া ঠাণ্ডিলালকে কেন যে লোকে পাগল বলে, ভেবে পান না রামচরিত। আদপেই যে তার মাথা খারাপ হয় নি, বরং সে যে একটা তুখোড় বজ্জাত, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাঁর। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'ও পাগল না ; এক নম্বরের শয়তান। বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে আজকাল—'

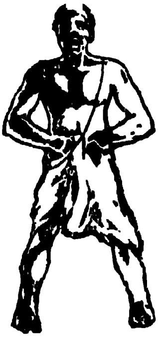
এদিকে চুনাও-কর্মীরা মজা দেখার জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নি ;

রাস্তা থেকে বড় বড় খোয়া তুলে ঠাণ্ডিলালের দিকে ছুঁড়তে থাকে।

'ভোটমাঙোয়া, ভিখমাঙোয়া—' ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে লাফ দিয়ে নিচে নেমেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে সামনের ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে পালিয়ে যায় ঠাণ্ডিলাল। বেজন্মার দলটাও গাছের ডালে বসে থাকে না ; ঝপাঝপ মাটিতে নেমে ছুটতে থাকে।

রামচরিত ঠাণ্ডিলালদের উধাও হওয়া দেখতে দেখতে গুণে দেখলেন, আজ নিয়ে তিনদিন ঠাণ্ডিলাল তাঁর পেছনে লাগল। ক্রমশ হারামজাদাটার বজ্জাতি শয়তানি এবং দুঃসাহস বাড়ছে। থমথমে মুখে রাজগৃহদের উদ্দেশে বলেন, 'আমার ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন এই হারামজাদকা বচ্চের একটা ব্যবস্থা করুন।'

রামচরিতের মুখচোখের চেহারা দেখে এবং গলার স্বর শুনে সবাই তটস্থ হয়ে ওঠেন, 'জরুর, জরুর—'



রেণ্ডিটুলিতে রামচরিতের ভোট চাইতে যাবার খবরটা সেদিনই হাওয়ায় হাওয়ায় গোটা লখিনপুরায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে এই ছোট শহর একেবারে তোলপাড় হয়ে যায়।

সব চাইতে বেশী ক্ষেপে গিয়েছিলেন গোমতী। এমনিতে তিনি খুবই নিস্পৃহ ধরনের মেয়েমানুষ। প্রচণ্ড শুচিবাই এবং তেত্রিশ কোটি দেবদেবী ছাড়া জগতের অন্য সব ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ খুবই কম। কিন্তু তিনিও স্বামীর বেশ্যাপাড়ায় যাওয়াটা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেন নি। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বলেছেন, 'ছিয়া ছিয়া ছিয়া! চৌবে বংশকে একেবারে নরকে ডুবিয়ে দিলে। এ আমি ভাবতেও পারি নি! কী পাপ, কী পাপ!'

কাচুমাচু ভঙ্গিতে রামচরিত বলেছেন, 'কী করব! চুনাওতে নেমেছি ; সবার কাছে গিয়ে তো হাত পাততে হবে।'

'কী দরকার ছিল বুড্‌ঢা বয়েসে চুনাও নিয়ে মাতামাতি করার?'

'তুমি তো জানই, হিন্দু ধরমের সুরক্ষার জন্যে—'

'তাই বলে ঐ বদ আওরতগুলোর কাছে যেতে হবে! ওদের ভোট ছাড়া জেতা যাবে না?'

রামচরিত স্ত্রীকে বোঝান, লখিনপুরার নির্বাচনে এখন যে ভয়ানক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তাতে রেণ্ডিটুলির চারশো পনেরটা ভোট খুবই জরুরি।

যাই হোক, পরনের জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে দশবার 'নাহানা' ক'রে এবং তিনবার পবিত্র গঙ্গাজলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুয়েও পার পান না রামচরিত। গোবর খেয়েও তাঁকে শুদ্ধ হতে হয়।

লখিনপুরার মানুষজনও এই নিয়ে কম হৈচৈ করে নি। চতুর্বেদীরা পুরুষানুক্রমে যে মর্যাদা এবং শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন, একদিনে তা শেষ ক'রে দিয়েছেন রামচরিত। রেণ্ডিটুলিতে গিয়ে যে দুর্গন্ধওলা পাঁক তিনি বংশের গায়ে মাখালেন, একশো বছর 'প্রায়শ্চিৎ' করলেও তার গন্ধ কাটবে না। এ কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য দেশকাল নিয়ে যারা একটু আধটু মাথা ঘামায় তারা কিন্তু বেশ খুশী। এদের সংখ্যা খুবই কম, আঙুলে গোণা যায়। তাদের মতে, এতদিনে চৌবেরা মানুষকে সম্মান দিতে শুরু করেছেন; দোসাদ হোক, ধাঙড় হোক, গাঙ্গাতো হোক বেশ্যা হোক—তারা সবাই মানুষ তো। যদিও ভোটের কারণেই তাদের কাছে রামচরিতের যাওয়া, তবু সমস্ত 'সমস্কার' ভেঙে শেষ পর্যন্ত যেতে তো পেরেছেন। এটা বিরাট ব্যাপার, 'মহত্ত্বপূর্ণ' কাজ।

তবে রেণ্ডিটুলিতে যাওয়া নিয়ে সব চাইতে বেশি জল ঘোলা করছে ধরতীলালেরা। তারা রামচরিতের বিরুদ্ধে লখিনপুরার বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে। এর কারণ আন্দাজ করা যায়; যেখানে নির্বাচনে জেতাটা প্রায় অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে বেশ্যাপাড়ার চারশো পনেরটা 'সলিড' ভোট হাতছাড়া হতে দেখে ওরা একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

আজ বিকেলে নয়াটুলিতে পদযাত্রা এবং জনসংযোগ শুরু করলেন রামচরিত। আগে থেকেই এই প্রোগ্রাম ঠিক করা ছিল। সেই অনুযায়ী নয়াটুলির মানুষজনকে জানিয়েও রাখা হয়েছে।

নয়াটুলি অর্থাৎ নতুন পাড়া। লখিনপুরা টাউনের পুব দিকের শেষ মাথায় আট দশ বছর হলো এই পাডাটা গজিয়ে উঠেছে। একেবারে

হাল আমলের বলে এখানকার বাড়িঘর রাস্তা সব কিছুই নতুন, ঝকঝকে।

রোজই পদযাত্রা এবং জনসংযোগের সময় চুনাও-কর্মীরা ছাড়াও রামচরিতের সঙ্গে থাকেন রাজগৃহ যতুনন্দন জগৎনারায়ণ মনপসন্দ এবং বিষ্ণুকান্ত। আজ বিষ্ণুকান্ত এবং মনপসন্দ জরুরি পারিবারিক কাজে আটকে যাওয়ায় আসতে পারেন নি। ওঁরা খবর পাঠিয়েছেন রাত্তিরে রামচরিতের বাড়ি গিয়ে দেখা করবেন।

নয়াটুলিতে চার পাঁচটা বাড়ি ঘুরবার পর আবহাওয়া খুব ভালো ঠেকল না রামচরিতের কাছে। যেখানেই যাচ্ছেন খাতিরদারি যে পাচ্ছেন না, তা নয়। কিন্তু ভোটের ব্যাপারে কেউ মন খুলে কিছু বলছে না ; অদ্ভুত ঠাণ্ডা চোখে শুধু তাকিয়ে থাকছে।

একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রামচরিত জগৎনারায়ণকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী মনে হচ্ছে বলুন তো ? নয়াটুলির ভোট কি আমরা পাব না ? আর যেখানেই যাচ্ছি লোকগুলো আমাকে কিভাবে দেখছে— লক্ষ্য করেছেন ? যেন আমি একটা আজব চীজ।'

জগৎনারায়ণ লক্ষ্য ঠিকই করেছেন কিন্তু কারণ বুঝতে পারেন নি। চিন্তাগ্রস্তের মতো কিছু একটা উত্তর দিতে যাবেন, হঠাৎ সামনের বাড়িটার দেয়ালে তাঁর চোখ আটকে যায়। সেখানে নানা রকম রং দিয়ে লেখা : লখিনপুরার রেণ্ডিটুলির মালিক কে ?—বিধানমণ্ডলীর প্রার্থী রামচরিত চতুর্বেদী।

চমকে জগৎনারায়ণ চারপাশের অন্য সব বাড়ির দেওয়ালগুলো দেখতে থাকেন। একটা দেওয়ালও ফাঁকা নেই। সব জায়গায় রামচরিতের কিম্ভূত চেহারার কার্টুন এঁকে তার পাশে লিখে রেখেছে : 'আওরত নিয়ে যে ব্যওসা করে তাকে ভোট দিয়ে এম. এল. এ. বানাবেন কিনা ভেবে দেখুন।' এগুলো কাদের কাজ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

জগৎনারায়ণ আঙুল বাড়িয়ে নিঃশব্দে দেওয়ালগুলো দেখিয়ে দেন।

নয়াটুলিতে আসার সময় দেওয়ালের লেখা বা কার্টুন লক্ষ্য করেন নি রামচরিত। এখন ওগুলো দেখতে দেখতে তাঁর হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসতে থাকে। পড়তে পড়তে রক্ত নেমে গিয়ে মুখটা ফ্যাকাসে দেখায়। মনে হয় হৃদ্‌পিণ্ডের ধকধকানি একেবারে থমকে গেছে। রীতিমত অসুস্থ বোধ করতে থাকেন তিনি। গল গল ক'রে ঘামতে ঘামতে বলেন, 'চলুন, ফিরে যাই। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে।'

এর পরও রামচরিতের শরীর অসুস্থ থাকাটাই অস্বাভাবিক। জগৎনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন, নয়াটুলিতে পদযাত্রা ক'রে আজ আর কাজ হবে না। ধরতীলালরা এখানকার মানুষজনের মনে এমন বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে যে তারা নির্বাচনের দিন রামচরিতের প্রতীকে মোহর মারবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তা ছাড়া সোসাইটির অনেক উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে রামচরিত এতকাল যে সম্মান আর শ্রদ্ধা আদায় ক'রে আসছিলেন, দেওয়ালের লেখাগুলো তা একেবারে চুরমার ক'রে দিয়েছে।

ধরতীলালরা চুনাওর এই লড়াইতে আচমকা যে মারাত্মক চালটি দিয়েছে তা ঠেকাবার জন্য নতুন এবং সূক্ষ্ম রণকৌশল ঠিক করতে হবে। জগৎনারায়ণ বলেন, 'হাঁ হাঁ, এখন বাড়িই ফেরা যাক।'

পদযাত্রা শুরু করার পর সঙ্গে গাড়িটাড়ি নিয়ে বেরোন না রামচরিত। কাজেই পায়ে হেঁটেই তাঁকে ফিরতে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে এবং দু' ধারের বাড়ির দেওয়ালগুলো দেখতে দেখতে তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীর সব কিছুই যেন কোনো অচেনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুলতে থাকে। শুধু নয়াটুলিই না, গোটা লখিনপুরা টাউনের সমস্ত দেওয়াল তাঁর ছবিতে আর কুৎসায় বোঝাই ক'রে ফেলেছে ধরতীলালেরা। প্রতিটি কুৎসার সারাংশ এইরকম : বাইরে 'বরাস্তনি'কা খেলা, ভিতরে লাখো পাপের মেলা।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যায়।

একতলায় বসবার ঘরে থমথমে মুখে বসে ছিলেন রাজগৃহ আর মনপসন্দ। রামচরিতরা ঢুকতেই দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আমাদের ভীষণ বিপদ রামচরিতজী—' তাঁদের খুবই উদ্বিগ্ন দেখায়।

রামচরিত উত্তর দেন না। টগবগে তেজী ঘোড়া দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে আচমকা ধাক্কা খেয়ে যেভাবে ঘাড় গুঁজে মুখ থুবড়ে পড়ে, অবিকল সেইভাবেই একটা সোফায় বসে পড়েন। এই অঘ্রাণ মাসে যখন বাইরে কনকনে উত্তুরে হাওয়া উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে তখন অনবরত তিনি ঘামতে থাকেন।

জগৎনারায়ণ অন্য একটা সোফায় বসতে বসতে বলেন, 'লখিনপুরার দীবারগুলো দেখে এলেন বুঝি?'

'হাঁ—' রাজগৃহ বলেন, 'তা ছাড়া মীটিংও শুনে এলাম।'

'কিসের মীটিং?'

'ধরতীলালদের। দিল্লী থেকে হরিজন লীডার নওলকিশোর ঠাকুর এসেছে। মুনসেফ কোর্টের সামনের মাঠে আজ মীটিং ছিল না? ক'দিন ধরে সমানে মাইক বাজিয়ে মীটিংয়ের কথা অ্যানাউন্স করছিল ধরতীলালের ওয়ার্কাররা। শোনেন নি?'

এবার মনে পড়ে যায় জগৎনারায়ণের। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'হাঁ হাঁ, রাস্তায় রাস্তায় ওরা মাইক বাজাচ্ছিল তো। তা মীটিংটা পুরাই শুনে এলেন?'

অচ্ছুৎ এবং মাইনোরিটিদের গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে হরিজন নেতার বক্তৃতা শুনবেন, রাজগৃহ তা ভাবতেও পারেন না। তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে যায় ধাঁ ক'রে। অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'কভী নেহী। কোর্টের পাশ দিয়ে আসছিলাম, নওলকিশোর তখন গলার নলিয়া ফাটিয়ে গাঁক গাঁক ক'রে চেঁচাচ্ছিল; কিছু কথা কানে এল।'

'কী বলছিল নওলকিশোর?' যদুনন্দন জানতে চান।

শিরদাঁড়া টান টান ক'রে খাড়া হয়ে বসেন রাজগৃহ। বলেন, 'খুব খারাপ কথা। বিলকুল চরিত্রহনন—ক্যারেক্টার অ্যাসঅ্যাসিনেশন। রামচরিতজী নাকি প্রস্টিটিউসনের ব্যওসা করেন। তার প্রমাণ দেবার জন্য বলছিল, লখিনপুরার রেণ্ডিটুলির জমিটা চতুর্বেদীদের, অর্থাৎ কিনা রামচরিতজীর। জমিটার মাপ কত তা-ও জানিয়ে দিচ্ছিল—চার বিঘা সতের কাঠা আট ধুর। তাই শুনে চামার দোসাদ ধাঙড়গুলো জানোয়ারদের মতো চেঁচাচ্ছিল, 'রামচরিত চৌবে, হায় হায়।' জোরে শ্বাস টেনে রাজগৃহ একটানা বলে যান, 'লোকটার কত বড় সাহস জানেন, এই লখিনপুরায় দাঁড়িয়ে সে বলে কিনা, রামচরিতজীর মতো আদমীকে জন প্রতিনিধি করা যায় না। গণতন্ত্রে এরকম বদ আদমীর জায়গা নেই। রামচরিতজী আদমী নেহী ; নরককা কীট হ্যায়সা। এখানে রেণ্ডিটুলি বসিয়ে লখিনপুরার সর্বনাশ ক'রে চলেছে চৌবেরা। ব্রাহ্মণ হলেও তাদের এই কাজটা বড়ই হীন, বহুত বুরা। কারো উচিত নয় এমন আদমীকে চুনাওতে জিতিয়ে বিধানমণ্ডলীতে পাঠানো। নওলকিশোর এক একটা কথা বলছিল আর অচ্ছুৎগুলো 'রামচরিত চৌবে, হায় হায়—' ক'রে চিল্লাচ্ছিল। এই স্লেণ্ডারিং থামাতে কিছু একটা করা দরকার। আমি তখনই বলে-ছিলাম, অচ্ছুৎটুলিতে আগুন ধরিয়ে দিই। ভূচ্চরের ছৌয়াগুলো ভয়ে সুড় সুড় ক'রে রামচরিতজীকে ভোট দিত। কিন্তু জগৎনারায়ণজী শুনলেন না। তাঁর মেথড হচ্ছে সফট আর সূক্ষ্ম। জানোয়ারদের ওপর ওসব পদ্ধতি চলে না।'

জগৎনারায়ণ শান্ত মুখে সব শুনে গেলেন ; উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন। রেণ্ডিটুলির সঙ্গে রামচরিতের সম্পর্কটা যে কী, সে সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা নেই। শুধু তাঁরাই না, এই ঘরে এখন আর যাঁরা আছেন তাঁদের ধারণাও ভাসা ভাসা।

জগৎনারায়ণ রামচরিতের উদ্দেশে বলেন, 'যদি অপরাধ না নেন, ক'টা কথা জিজ্ঞেস করব। যেভাবে ধরতীলালরা আপনার নামে

কলংক্ ছড়াচ্ছে, চরিত্রহনন করছে, সেটা ঠেকাবার জন্যে আমার কিছু খবর জানা দরকার।'

নির্বাচনে যাঁরা রামচরিতকে নামিয়েছেন এবং প্রতি মুহূর্তে নানা ভাবে সাহায্য ক'রে যাচ্ছেন তাঁরা সবাই বুদ্ধিমান শিক্ষিত এবং খুবই প্রভাবশালী মান্যগণ্য মানুষ। এঁদের সকলকেই সমীহ করেন রামচরিত। কিন্তু জগৎনারায়ণের ওপরই তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাস সব চাইতে বেশী। রাজনীতি, সামাজিক শ্রেণীভেদ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অন্য সকলের ধ্যান ধারণা মান্ধাতার আমলের। পৃথিবী যে বদলে যাচ্ছে, শুধু যে পাহেলবান লেলিয়ে, লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে, গুলি চালিয়ে, আওরতদের ইজ্জৎ নষ্ট ক'রে বা অচ্ছুৎটুলির ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে এখন আর সব কিছু আদায় করা যায় না, রাজগৃহরা এটা বুঝতে চান না। পরে এই নিয়ে প্রচুর ঝঞ্ঝাট হয়। কলকাতা দিল্লী বোম্বাই পাটনা থেকে খবরের কাগজের পত্রকাররা ফটোগ্রাফার নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে; সারা দেশ জুড়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু ক'রে দেয়। কিছুদিন আগে জেলখানায় কয়েদীদের অন্ধ করা নিয়ে, তারও আগে সাহারসায় অচ্ছুৎদের গাঁ জ্বালিয়ে পঁচিশ-জন ধাঙড়কে পুড়িয়ে মারার কারণে কম গোলমাল হয় নি। মোটা দাগের মধ্যযুগীয় ফিউডাল পদ্ধতি এখন অচল হয়ে আসছে। নিজেদের দখল এবং প্রভুত্ব রাখার জন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন রণকৌশলও দরকার। জগৎনারায়ণ এই কথাগুলোই প্রথম থেকে বার বার বলে আসছেন। দীর্ঘকাল কলকাতার মতো বিশাল শহরে থাকা এবং নানা রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি দেখার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর বেড়ে গেছে। সেগুলোকেই রামচরিতের নির্বাচনী লড়াইতে কাজে লাগাতে চাইছেন তিনি। এই সব কারণে রামচরিতের কাছে তাঁর স্ট্র্যাটেজি এবং পরামর্শ খুবই দামী। পৃথিবী যে অনড় স্থবির হয়ে বসে নেই, এই কথাটা জগৎনারায়ণই প্রথম তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

উৎসুক চোখে জগৎনারায়ণের দিকে তাকান রামচরিত। বলেন,

'কী জানতে চান বলুন—'

'রেণ্ডিটুলির জমিটা কি সত্যিই আপনাদের ?' কোনোরকম আজেবাজে ভণিতা না ক'রে সোজাসুজি প্রশ্নটা করেন জগৎনারায়ণ।

ঐ জমিটার বিষয়ে আগে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে নি বা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি। শুধু রামচরিতকেই না, পবিত্র চতুর্বেদী বংশের কাউকেই এ নিয়ে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় নি। রামচরিত প্রথমটা হকচকিয়ে যান। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'হাঁ—'

জগৎনারায়ণ বলেন, 'কার নামে আছে জমিটা ? আপনার ?'

'নেহী'।

'তবে কার—ভাবীজির ?'

'নেহী'। আমাদের একটা নৌকর ছিল—দুখিয়া— তার নামে।'

বিমূঢ়ের মতো জগৎনারায়ণ বলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

রামচরিত এবার যা জানান তা এইরকম। ষাট সত্তর বছর আগে রেণ্ডিটুলির ঐ জায়গায় থাকত অচ্ছুৎরা। কী কৌশলে যেন তাঁর ঠাকুরদা রামসিংহাসন ওটা দখল ক'রে নেন। অচ্ছুৎরা টিন এবং বাঁশের ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে দূরে বেওয়ারিশ একটা জঙ্গল সাফ ক'রে নতুন বসতি বানায়। এখনকার অচ্ছুৎটুলিটা সেখানেই।

সে সময় লখিনপুরা এমন জমজমাট টাউন হয়ে ওঠে নি। মিউনিসিপ্যালিটি, বিজলি বাতি, পাকা সড়ক বলে এখানে কিছুই ছিল না। রামসিংহাসন সরকারী ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে জায়গাটা নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে নেন। তিরিশ বছর পর লখিনপুরা মিউনিসিপ্যালিটিতেও রেকর্ড করান। পরবর্তী বংশধরদের জন্য সব ব্যবস্থা খুবই সুচারুভাবে তিনি পাকা এবং নিশ্ছিদ্র ক'রে যান।

কিন্তু জমিদারি বিলোপের সময় এতকাল মসৃণ নিয়মে যে সিস্টেম চলে আসছিল হঠাৎ তা একটা ধাক্কা খায়। নির্দিষ্ট মাপের অতিরিক্ত

জমি কেউ রাখতে পারবে না। কিন্তু পার্লামেন্টে আইন পাশ হয়ে গেলেও তা মেনে চলার ইচ্ছা উত্তর বিহারের বড় জমি মালিকদের ছিল না। আইনের ভেতর হাজার ফোকর বার ক'রে তারা সসাগরা পৃথিবীকে নিজের মুঠোতেই পুরে রেখেছিল। আইনের সাধ্য কি সেই মুঠো আলগা ক'রে এক ধুর জমিও ছিনিয়ে নেয়।

রামসিংহাসন তখন বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর ছেলে রামশরণ ছিলেন। বাবার টাকাপয়সা, সোনাচাঁদি, বিশাল জমিজমার সঙ্গে তাঁর তুখোড় বৈষয়িক বুদ্ধির উত্তরাধিকারও তিনি পেয়েছিলেন। নৌকর দুখিয়ার নামে রেণ্ডিটুলির ঐ জায়গাটা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন। কাজেই জমিটা তাঁদের, আবার তাঁদের না।

আরামের নিশ্বাস ফেলেন জগৎনারায়ণ। বলেন, 'সমঝ গিয়া। মিউনিসিপ্যালিটির আগের রেকর্ডটার কথা হয়ত শুনেছে ধরতীলালরা। সেই খবর সাপ্লাই করেছে নওলকিশোর ঠাকুরকে ; নওলকিশোর মাইক ফাটিয়ে তার ওপর বক্তৃতা দিয়েছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, 'দুখিয়া এখন কোথায় ?'

'ওদের গাঁওয়ে—মতিহারিতে। অনেক বয়েস হয়েছে। এখন আর খাটতে পারে না। তার ওপর রয়েছে বুকের দোষ—ভীষণ সাঁসের (শ্বাস) কষ্ট। তাই দেশে পঠিয়ে দিয়েছি। বেশিদিন দুখিয়া বাঁচবে না।' রামচরিত্র বলতে থাকেন, 'ভাবছি, চুনাওটা হয়ে গেলে আর কারো নামে জমিনটা বেনামা ক'রে দেব।'

জগৎনারায়ণ বলেন, 'যাক, দুখিয়া বলে যে কেউ আছে, এটা ভালো খবর। অনেকে তো এমন সব ভুয়া নামে বাড়ি জমিন বেনামা করেছে দুনিয়ায় যাদের অস্তিত্বই নেই। জরুরত হলে দুখিয়াকে এনে দাঁড় করানো যাবে।'

এরপর অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে একটা জরুরি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। চুনাও-কর্মীদের দিয়ে লখিনপুরা এবং

আশেপাশের গাঁ-গঞ্জগুলো পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ফেলতে হবে। পোস্টারগুলোতে লেখা থাকবে : রেণ্ডিটুলির জমিটার মালিক দুখিয়া সিং রাজপুত। রামচরিত্র চতুর্বেদীর সঙ্গে ওটার কোনো সম্পর্ক নেই। বিরুদ্ধ পক্ষের প্রার্থী নেহাতই একজন সম্মানিত মানুষের গায়ে পাঁক ছিটিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠাতে চাইছে। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। লখিনপুরার মানুষ বোকা নয়, তাদের মাথায় গোবর ঠাসা নেই। তাদের ধোঁকা দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেওয়া সহজ না। তাদের ভালো-মন্দের বিচার আছে। কীসে তাদের হিত, কীসে ক্ষতি, সেটা তারা জানে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই পোস্টারগুলো লাগাতে হবে রাতারাতি—একেবারে যুদ্ধ-কালীন তৎপরতায়। কেননা, যত দেরি হবে ততই ধরতীলালদের কুৎসাটা লোকের নাথায় বসে যাবে। ওটা স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারলে চুনাওতে রামচরিত্তের ভরাডুবি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

বাড়ির পেছন দিকের ক্যাম্পে আজকাল চুনাও-কর্মীরা অনেক রাত পর্যন্ত থাকে। তৎক্ষণাৎ তাদের ডেকে পাঠিয়ে পোস্টারের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

দু'দিন পর দেখা যায় নতুন নতুন পোস্টারে লখিনপুরা এবং তার চারপাশ ছেয়ে গেছে।

কিন্তু তাতে আদৌ কোনো সুফল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। লখিনপুরার বাসিন্দারা কেউ সঠিক বুঝে উঠবার আগেই ধরতীলালদের নতুন পোস্টার পড়ে। সেগুলোতে লেখা রয়েছে : দুখিয়া সিং রাজপুত চৌবেদের নৌকর। রামশরণ চতুর্বেদী দুখিয়ার নামে রেণ্ডিটুলির জমিন বেনামা ক'রে দিয়েছিল। দলিলপত্রে যার নামই থাক, আসলে ঐ জমিনের মালিক এখন রামচরিত চতুর্বেদী।

নতুন পোস্টারগুলোতে একটা ভয়ংকর কথা লিখেছে ধরতীলালরা। রামচরিত তাঁর পোস্টারে জানিয়েছেন রেণ্ডিটুলির

মালিক তিনি নন—দুখিয়া নৌকর। কিন্তু কোথাও তিনি জানান নি আওরত নিয়ে নোংরা পাপের ব্যবসা এখনই বন্ধ করতে হবে। জানান নি, পঞ্চাশ ষাট সাল ধরে রেণ্ডিটুলিটা লখিনপুরার সর্বনাশ ক'রে দিচ্ছে ; ওটা তুলে দিতে হবে।

শুধু নতুন পোস্টারই ওরা লাগায় নি। অচ্ছুৎ মুসলমান এবং খ্রীস্টান মাইনোরিটিরা মিলে রোজই বিরাট মিছিল বার করছে। ওদের স্লোগান এখন একটাই।

'রেণ্ডিটুলিকা মালিক কৌন ?'

'বেনামদার রামচরিত চৌবে।'

'আওরতকা কারোবার কিঁউ নেহী বন্ধ হোতা ?'

'রামচরিত চৌবে জবাব দো, জবাব দো।'

'ইস টৌনমে রেণ্ডি কিঁউ ?'

'রামচরিত চৌবে জবাব দো, জবাব দো।'

'রামচরিত চৌবে—'

'হায় হায়।'

ধরতীলালরা মিছিল বার করার পর দু-একদিন রামচরিতরাও মিছিল ক'রে লখিনপুরার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, রেণ্ডিটুলির সঙ্গে তাঁর আদৌ সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাঁদের মিছিলে লোকজন তেমন হয় নি। উঁচু বর্ণের লোকেরা অচ্ছুৎ বা মাইনোরিটিদের ঘৃণা করে, পারতপক্ষে তাদের ছায়া মাড়ায় না। তাই বলে নিজেদের মধ্যেও তাদের সলিডারিটি নেই। প্রথম দিন যা-ও কিছু লোক জুটেছিল, পরে তা-ও কমতে থাকে। আসলে এদের স্বভাবই হল নিজেদের নিয়ে থাকা। অথচ হিন্দুধর্ম, হিন্দু কালচারের সুরক্ষার জন্য রামচরিত যে জীবন দিয়ে দিচ্ছেন সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

এদিকে মিছিল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার সময় অনেকে রেণ্ডিটুলি নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছে। জানিয়েছে, বেশ্যাপাড়াটা এখনই তুলে দেওয়া দরকার। মুখের ওপর সরাসরি না বললেও, ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে ওরা জানিয়েছে লখিনপুরার রেণ্ডিটুলি থাকার যাবতীয় দায় চৌবেদেরই। রামচরিতের উচিত ওটা এই মুহূর্তে তুলে দেওয়া।

আগে এ জাতীয় কথা বলার সাহস বা স্পর্ধা কারো হতো না। আজকাল ধরতীলালদের মদত পেয়ে সবার বুকের পাটা বেড়ে গেছে। চুনাও পর্যন্ত কাউকে কিছু বলবেন না রামচরিত। তারপর কিছু একটা করতেই হবে। জগৎনারায়ণের সূক্ষ্ম চতুর পদ্ধতি সব সময় বিহারের এই সব অঞ্চলে খাটে না ; মধ্যযুগীয় বর্বর ফিউডাল সিস্টেম এখনও দীর্ঘকাল এখানে জীইয়ে রাখা দরকার।

দিন কয়েক বাদে, সারা বিকেল মিছিল নিয়ে ঘোরার পর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে জগৎনারায়ণ বলেন, 'আমাদের হায়ার কাস্টের লোকেদের একাত্মতা নেই। রেণ্ডিটুলিকা বারেমে হর রোজ রামচরিতজীকো চিড়াতা হ্যায়। আরে বাবা, খুদ রামচরিতজী তোদের স্বার্থরক্ষার জন্যে চুনাওতে নেমেছেন। তাঁকে এ সব আজেবাজে কথা বিরক্ত করা কেন?'

মনপসন্দ বলেন, 'উনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চেয়েছেন। এ তোদের চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ। কোথায় চোখ বুজে ভোট দিবি, তা নয়। এত বড় একটা আদমীকে শুধু ঝামেলায় ফেলা—'

যদুনন্দন নাক কুঁচকে বলেন, 'যত সব গিদ্ধড়ের পাল।'

একধারে চুপচাপ চিন্তাগ্রস্তের মতো বসে ছিলেন রামচরিত। এবার বলেন, 'আমি একটা ব্যাপারে মন ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

সবাই উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

রামচরিত বলেন, 'রেণ্ডিটুলিটা আমাদের জমি থেকে তুলে দেব।'

জগৎনারায়ণ চমকে ওঠেন, 'কী বলছেন রামচরিতজী! ভেবে দেখেছেন এর কী রি-অ্যাকসান হবে!'

'অনেক ভেবেছি। এ ছাড়া নিজের আর বংশের সুনাম বাঁচানো যাবে না।'

'রেণ্ডিটুলি উঠিয়ে দিলে দু'দিক থেকে বিপদ দেখা দেবে।'

রামচরিত জিজ্ঞেস করেন, 'কী রকম?'

'এক এক ক'রে বলছি। প্রথমত, বেশ্যাপাড়ার চারশো পনেরটা সলিড ভোটের আশা ছাড়তে হবে। পেটে হাত পড়লে ওরা কিছুতেই আমাদের ভোট দেবে না। চুনাওতে জিততে হলে এই ভোটগুলো কিন্তু খুবই জরুরি।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন জগৎনারায়ণজী। কিন্তু অন্য দিকটা ভেবে দেখেছেন কি?'

'কোন দিকটা?'

'ওদের না তুলে দিলে ব্রাহ্মণ-কায়াথদের ভোট আমরা পাব বলে মনে হয় না। চারশো পনেরটা ভোটের জন্যে হাজার হাজার ভোটের ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হবে?'

জগৎনারায়ণকে চিন্তিত দেখায়। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেন, 'হাঁ, এ ব্যাপারটা আমি ভাবি নি। আপার কাস্টের লোকেরা হঠাৎ লখিনপুরাকে কেন যে স্বর্গরাজ্য বানাতে চাইছে বুঝতে পারছি না। তবু বলছি ব্রাহ্মণ-কায়াথদের সব ভোট পেলেও ঐ চারশো পনেরটা ভোটও খুব দরকার।'

বিষ্ণুকান্ত ওধার থেকে বলে ওঠেন, 'যেভাবে পোলারাইজেসন হয়েছে তাতে ফিফটি পারসেন্ট ভোট আপার কাস্টের, বাকি ফিফটি পারসেন্ট অচ্ছুৎ মাইনোরিটি আর তাদের সিমপ্যাথাইজারদের। মাঝখানের ঐ চারশো পনেরটা ভোট যেদিকে যাবে চুনাওতে তারই জেতার সম্ভাবনা বেশী।'

রামচরিত বলেন, 'যা হবার হোক; বেশ্যাপাড়াটা আমাকে তুলে দিতেই হবে।' তাঁকে খুবই জেদী এবং একরোখা দেখায়। একটু চুপ ক'রে থেকে কিছু ভাবেন রামচরিত। তারপর জগৎনারায়ণকে জিজ্ঞেস করেন, 'দুসরা বিপদের কথা কী বলছিলেন?'

জগৎনারায়ণ বলেন, 'রেণ্ডিটুলিটা তুলে দিলে লোকে বিশ্বাস

করবে ঐ জমিনটা আপনাদের।'

রামচরিত বলেন, 'আপনি তো ভারী ভারী সিটিতে থেকেছেন, কত কিছু দেখেছেন। আপনি জানেন, মানুষ হচ্ছে ভেড়ের পাল।' একনাগাড়ে এরপর তিনি যা বলে যান তা এইরকম। পর পর ক'টা মীটিং ক'রে তিনি জানিয়ে দেবেন, রেণ্ডিটুলির ঐ জায়গাটা ছুখিয়া সিং রাজপুতের। সে আওরতের কারবার ওখানে চলছে তার দায়িত্ব ছুখিয়ার। অনবরত গলার জোরে চেঁচিয়ে গেলে মিথ্যেও শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যেখানে ভেড় বকরীর পাল সেখানে তাঁদের কোনো কিছু বিশ্বাস করানো খুব একটা দুরূহ ব্যাপার না।

তা ছাড়া, রেণ্ডিটুলি তুলে দেবার কথা বললে তখন আর কেউ ঐ জমিনের মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এত বড় একটা 'পুণ'কা কাজের (পুণ্যকর্ম) জন্য জনমত রামচরিতের পক্ষেই চলে আসবে।

শুনতে শুনতে রীতিমত অবাকই হয়ে যান জগৎনারায়ণ। ছোট টাউনের মারাত্মক গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং বড় জমিমালিক রামচরিত চৌবে সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচু ছিল না। ফিউডাল সিস্টেমের আধা-শহুরে আধা-গ্রাম্য প্রতিনিধিরা যেমন হয় রামচরিতকে তেমনই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে রামচরিতের অভিজ্ঞতা বিশাল। বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে ঘিরে মানুষের যে উত্তেজনা টগবগ ক'রে ফুটতে থাকে তা নিজের দিকে ঘুরিয়ে কাজে লাগাবার কৌশল তিনি জানেন।

রামচরিত সম্পর্কে ধারণা বদলে যাওয়া সত্ত্বেও খুঁত খুঁত করতে থাকেন জগৎনারায়ণ। বলেন, 'সব আপার কাস্ট ভোট পেলেও ঐ চার শো পনেরটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

'পরে ভাবা যাবে। এখন মীটিং করা দরকার। কাল-পরশুর ভেতর মীটিংয়ের ব্যবস্থা করুন।'

মুনসেফ কোর্টের সামনের মাঠে পর পর তিন দিন মীটিংয়ের

আয়োজন করা হয়। তিন দিনই রামচরিত গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করেন, রেণ্ডিটুলির জমিনটা ছুখিয়া সিং রাজপুতের। মিউনিসিপ্যালিটি এবং সরকারী খাজনা বিভাগে খবর নিলেই লখিনপুরার বাসিন্দারা তা জানতে পারবেন। এর সঙ্গে চতুর্বেদী বংশের কোনো সম্পর্ক নেই।

গভীর আবেগের গলায় রামচরিত আরো জানান, লখিনপুরার কল্যাণের জন্য রেণ্ডিটুলিটা তুলে দিতেই হবে। এ বিষয়ে সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে তিনি একমত। বেশ্যাপাড়াটা এ শহরের 'কলংক্'। এটা যাতে উঠিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য অবিরাম চেষ্টা ক'রে যাবেন।

শ্রোতারা তিনদিনই রামচরিতের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। আর রামচরিত মনে মনে হেসেছেন, ভেড়ের পাল তাঁর দিকে ফিরে আসছে।



তৃতীয় দিন মীটিংয়ের পর সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই রামচরিতরা জরুরি আলোচনায় বসেন। রোজই মীটিং মিছিল পদযাত্রা বা জনসংযোগের পর সবাই একসঙ্গে বসবেনই। বসার উদ্দেশ্য, সারাদিনে কাজ কতটা এগুলো তা খতিয়ে দেখা এবং সেই অনুযায়ী পরের দিনের কার্যক্রম বা প্রোগ্রাম ঠিক করা।

আজ মোটামুটি সকলেই খুশী। রেণ্ডিটুলি তুলে দেবার ঘোষণায় নির্বাচনী আবহাওয়া রীতিমত বদলে গেছে। জনমত এখন অনেকখানিই রামচরিতের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। বিশেষ ক'রে আপার কাস্ট ভোটাররা যে তাঁর পক্ষেই মতদান করবে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার আঁচ পাওয়া গেছে।

বিষ্ণুকান্ত বলেন, 'এখন ফিফটি পারসেন্ট ভোট যে আমরা পাবই তার গ্যারান্টি দিতে পারি।'

জগৎনারায়ণ বলেন, 'বাকি ভোট ধরতীলাল পাবে এটাও সার্টেন। কিন্তু রেণ্ডিটুলির চারশো পনেরটা ভোটের কী হবে, বুঝতে পারছি না।'

রামচরিত বলেন, 'ঐ ভোটগুলো খুব সম্ভব আমরাই পাব।'

বিমূঢ়ের মতো জগৎনারায়ণ জিজ্ঞেস করেন, 'বেশ্যাপাড়া তুলে দেবার পর ওরা ভোট দেবে বলে মনে হয় না।' তাঁকে বেশ হতাশই দেখায়। রামচরিতের মতো এতটা আশাবাদী তিনি হতে পারছেন না। মনের ভেতর একটা খিঁচ আর অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

রামচরিত জানান, তাঁর মাথায় বেশ্যাপাড়া সম্পর্কে আবছাভাবে একটা পরিকল্পনা এসেছে। সেটা কাজে লাগাতে পারলে ঐ চারশো পনেরটা ভোট নিশ্চিত পাওয়া যাবে।

অঘ্রাণ মাসের এই হিমবর্ষী রাত্তিরে ঘরের ভেতর তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। সবাই নড়েচড়ে বসেন। সমস্বরে বলেন, 'কী ভেবেছেন রেণ্ডিটুলির ব্যাপারে?'

রামচরিত বলেন, 'আরেকটু ভাল ক'রে ভেবে নিই। দু-একদিনের মধ্যেই আপনাদের জানাবো।'

অনেক রাত্তিরে জগৎনারায়ণরা চলে যাবার পর দোতলায় উঠে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়েন রামচরিত। পঁচিশ ফুট দূরে এ ঘরের অন্য একটা খাট থেকে গোমতীর নাক ডাকার আওয়াজে এখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া পৃথিবীর এই অংশে আর কোনো শব্দ নেই।

বিছানায় গা ঢেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে যায় রামচরিতের। চুনাওতে নামার পর থেকে মীটিং মিছিল পদযাত্রা এবং জনসংযোগ নিয়ে সারাদিন এমন প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাটে যে শুতে না শুতেই টান টান স্নায়ুগুলো আলগা হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ জুড়ে আসে।

কতক্ষণ পর কে জানে, হঠাৎ বাইরে চাপা গলার একটানা ডাকাডাকিতে ঘুমটা ছুটে যায় রামচরিতের।

'বড়ে সরকার, বড়ে সরকার—'

চারটে ভারী লেপের তলা থেকে ঘুমজড়ানো গলায় রামচরিত শুধোন, 'কৌন?'

'হামনি—ঘমণ্ডি।'

ঘমণ্ডি এ বাড়িতেই ঘোড়ার শেডগুলোর পাশের একটা খুপরিতে থাকে। কিন্তু এত রাত্তিরে কোনো দিনই ওপরে আসে না। সাঙ্ঘাতিক জরুরি কারণ না ঘটলে সে কিছুতেই ঘুম ভাঙাতো না। রামচরিত

যতটা অবাক হন, তার চাইতে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। বলেন, 'কী হয়েছে ?'

'সরকার, বাইরে আসুন—' গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা নেমে যায় ঘমণ্ডির।

রামচরিত বুঝতে পারেন, গোমতীর ঘুম না ভাঙিয়ে গোপনে কোনো খবর দিতে চায় ঘমণ্ডি। কিন্তু এই অসহ্য শীতের রাতে বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছা করে না। ফের বলেন, 'কী হয়েছে বল্ না—'

ভয়ে ভয়ে আবার বাইরে যাবার কথা বলে ঘমণ্ডি।

অগত্যা লেপের তলা থেকে বেরুতেই হয় রামচরিতকে। শীতের রাত্তিরে মাথার বালিশের পাশে একটা কাশ্মিরি শাল রেখে ঘুমোন তিনি। কোনো কারণে বেরুতে হলে ওটা দরকার হয়।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শালটা বার ক'রে গায়ে মাথায় জড়িয়ে চুপিসাড়ে দরজা খুলে বাইরে আসেন রামচরিত।

আজন্মের বিশ্বস্ত নৌকর ঘমণ্ডি ধুসো কম্বলে সমস্ত শরীর ঢেকে বারান্দার এক ধারে দাঁড়িয়ে আছে। রামচরিতকে দেখামাত্র সে বলে, 'ওহী আদমী আয়া হ্যায়—'

'কৌন ?' রামচরিত জিজ্ঞেস করেন।

'ওহী—রেণ্ডিটুলিকা চৌপটিয়া। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

এখন মাসের মাঝামাঝি সময় নয়। পনের ষোল বা সতের তারিখ ছাড়া চৌপটলাল কখনও এদিকে আসে না। হঠাৎ কী এমন হল যে এই অসময়ে সে হানা দিয়েছে! খুবই বিরক্ত হন রামচরিত, বলা যায় রেগেই যান। কর্কশ গলায় বলেন, 'এত রাতে দালালটা কেন এসেছে জানিস ?'

রামচরিতের মেজাজ আঁচ ক'রে ভীষণ ঘাবড়ে যায় ঘমণ্ডি। বলে, 'আমাকে কিছু বলে নি হুজৌর—'

অর্থাৎ এত রাতে আসার উদ্দেশ্যটা সরাসরি রামচরিতকেই

জানাতে চায় চৌপটলাল ; অন্য কাউকে নয়।

একটুক্ষণ কি ভাবেন রামচরিত। তারপর বলেন, 'দালালটা কোথায় ?'

ঘমণ্ডি জানায়, বরাবর চৌপটলাল যেখানে আসে—বাউণ্ডারি ওয়ালের বাইরের দিকের সেই ছোট তালাবন্ধ ঘরটায় বড়ে সরকারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

'আচ্ছা, চল্—'

শোবার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে খুব আস্তে, এতটুকু শব্দ না ক'রে টেনে দেন রামচরিত। গোমতীর ঘুম খুবই ঠুনকো, সামান্য আওয়াজেই ভেঙে যায়। মধ্যরাতে রামচরিত নিয়মিত রুটিনের বাইরে আরো একদিন বেশ্যার দালালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, গোমতী তা জানতে পারলে আর রেহাই আছে! দশবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাঁকে 'শুধ্' ক'রে নেবেন। কে বলতে পারে, এই শীতের রাতে তিনবার 'নাহানা'ই করতে হবে কিনা।

দরজা বন্ধ ক'রে ঘমণ্ডির সঙ্গে নিচে নামতে নামতে রামচরিত সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন, 'ভূচ্চরটার তো এসময় আসার কথা নয়। তুই ওকে পেলি কোথায় ? জানবরটা বাড়ির ভেতর ঢুকে তোকে দিয়ে খবর পাঠায় নি তো ?' রামচরিতের ভয়, রেণ্ডিটুলির দালাল এ বাড়িতে ঢুকে চতুর্বেদী বংশের শুদ্ধতা নষ্ট ক'রে দিয়েছে কিনা।

ঘমণ্ডি বলে, 'নহী নহী হুজৌর। বাহারকা দরবাজা বন্ধ্ হ্যায়। ওহী আদমী ঘুসেগা ক্যায়সে ?'

আরে তাই তো, বাইরের দশ ফুট উঁচু পেতলের ভারী ভারী গুল-বসানো প্রকাণ্ড গেট জগৎনারায়ণরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দারোয়ান চৌধারী সিং বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। ঐ বিরাট ফটক ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব।

রামচরিত এই ভেবে আরাম বোধ করেন, চৌবেদের বাড়ির বাউণ্ডারি ওয়ালের ভেতরকার পবিত্রতা অন্তত অক্ষুণ্ণই আছে। শুধোন,

'তা হলে জানবরটার সঙ্গে তোর দেখা হল কী ক'রে?'

ঘমণ্ডি জানায়, মাঝরাতে ছাদে উঠে সে দেখতে পায় বাড়ির পেছন দিকে বার বার টর্চ জ্বালিয়ে এবং নিভিয়ে চৌপটলাল সংকেত দিচ্ছে। তখন নিচে নেমে গিয়ে সে তার সঙ্গে দেখা করে।

আসলে ঘমণ্ডির কাজ হল, দিনভর রামচরিতের হুকুম তামিল করা এবং ঘোড়াদের দানা খাওয়ানো। আর রাত্তিরে মাঝে মাঝে উঠে দেখা, কোনো চোর ছ্যাঁচড় ডাকু দুশমন ভেতরে ঢুকছে কিনা। পাহারাদারির কারণেই সে কিছুক্ষণ আগে ছাদে উঠেছিল।

রামচরিত আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে ওঁরা বাড়ির পেছন দিকে চলে এসেছিলেন। ডানদিকে হাতী এবং মাহুতদের শেড, বাঁয়ে চুনাও-কর্মীদের ক্যাম্প। ক'দিন হল, চুনাও-কর্মীরা রাত্তিরে এখানে থাকছে।

এই মুহূর্তে হাতী মাহুত বা নির্বাচন-কর্মীদের কেউ জেগে নেই। তবু পাছে তাদের ঘুম ভেঙে যায় তাই পা টিপে টিপে রামচরিতরা নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে থাকেন।

শুধু হাতী টাতি বা চুনাও-কর্মীরাই নয়, এখন পৃথিবীর কোথাও কেউ জেগে নেই। পাখি পতঙ্গ বা ঝিঁঝিদের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এমন কি রাতজাগা কামার পাখিগুলোও গাছের ফোকর থেকে বেরোয় নি।

অঘ্রাণ মাসের এই মধ্যরাতে গাঢ় কুয়াশায় সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাটির লক্ষ কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে শীতের অসহ্য হিম। আকাশ সমান উঁচু ভারী কুয়াশার তলায় অসাড় পড়ে আছে উত্তর বিহারের নগণ্য শহর লখিনপুরা।

চুনাও-কর্মীদের ক্যাম্প পেরিয়ে যাবার পর দু'জনেই ফুসফুসের আবদ্ধ বাতাস বার ক'রে দিয়ে আস্তে শ্বাস টানেন। আর তখনই আচমকা কি মনে পড়ে যায় ঘমণ্ডির। ভীরু গলায় সে বলে, 'একগো

বাত ভুল গিয়া হুজৌর— বহোত কসুর হো গিয়া—'

রামচরিত্ বলেন, 'কী ভুলে গেছিস ?'

'চৌপটিয়াকা সাথ আউর একগো আদমী আয়া হ্যায়—'

'আদমী !' রামচরিতের গলার স্বর রুক্ষ শোনায়। তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়।

অন্ধকারেও প্রভুর ভ্রূকুঞ্চন যেন দেখতে পায় ঘমণ্ডি। শশব্যস্তে, শ্বাসটানার মতো শব্দ ক'রে তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নেয় ঘমণ্ডি। 'মাফি মাঙ্‌তা হুজৌর। আদমী নহী—আওরত।'

রামচরিত চমকে ওঠেন। কোন মেয়েমানুষ সঙ্গে ক'রে এনেছে চৌপটলাল ? উদ্দেশ্য কী তার ? তবে কি, তবে কি—

ভাবতে ভাবতে বাউণ্ডারি ওয়ালের ছোট দরজা গলে বাইরের সেই ঘরে চলে আসেন রামচরিত। ঘমণ্ডি ভেতরে ঢোকে না, চিরকালের নিয়মঅনুযায়ী বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন রামচরিত। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে আগুনের হল্কার মতো কী যেন দুরন্ত গতিতে ছুটতে থাকে। চৌপটলাল নেই, ঘরের এক কোণে একটা ভারী চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে রতিয়া।

অনেকক্ষণ গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না রামচরিতের। শুধু টের পান, শিরদাঁড়ার সেই হল্কাটা দ্রুত সমস্ত রক্তস্রোতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে প্রায় অলৌকিক যে নারীদেহ এতদিন দেখেছেন সেটা এই মুহূর্তে তাঁর তিন হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় কাঁপা গলায় রামচরিত শুধু বলতে পারেন, 'তুম ?'

হাতজোড় ক'রে ভীরু গলায় রতিয়া বলে, 'হাঁ সরকার।'

'চৌপটলাল কোথায় ?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমাকে এখানে রেখে বাইরে গেছে। বাত হয়ে গেলে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

রতিয়াকে তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বেশ্যার দালালটা কোন

মতলব হাসিল করতে চায়, কে জানে। তবে এটা যে তার চতুর সূক্ষ্ম চাল তা টের পাওয়া যায়।

যদিও রতিয়া মোটা চাদর জড়িয়ে রয়েছে তবু নিজের অজান্তে বার বার সেটা ফুঁড়ে রামচরিতের চোখ আওরতটার আগুনের শীষের মতো নগ্ন শরীর দেখতে চাইছে। আগের মতোই কাঁপা গলায় তিনি শুধোন, 'আমার কাছে কী দরকারে এসেছ?'

'হুজৌর মা-বাপ, আপনি আমাদের রক্ষা (রক্ষা) করুন।'

রতিয়াদের এখানে আসার কারণটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায়। তবু রামচরিত বলেন, 'আমি কীভাবে রক্ষা করব? কী হয়েছে তোমাদের?'

রতিয়া এবার জানায়, পরপর তিনদিন মুনসেফ কোর্টের মাঠে রামচরিত মীটিং ক'রে ঘোষণা করেছেন, লখিনপুরার রেণ্ডিটুলি উঠিয়ে দেবেন। তাতে ওখানকার আওরতেরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। টুলি উঠে গেলে তারা খাবে কী? স্রিফ ভুখা মরতে হবে এতগুলো মেয়েকে।

বেশ্যাপাড়াটা যাতে তুলে না দেওয়া হয়, তারই জন্য আর্জি জানাতে রামচরিতের কাছে রতিয়াকে নিয়ে এসেছে চৌপটলাল। নেহাতই এটা 'পেটকা সওয়ালে'র ব্যাপার। হুজৌর মা-বাপ, তাদের বাঁচান।

রেণ্ডিটুলিতে এত মেয়ে থাকতে বেছে বেছে রতিয়াকে নিয়ে আসার পেছনে চৌপটলালের ধূর্ততা টের পাওয়া যায়। বেশ্যার দালালটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, রতিয়াকে দেখলে রামচরিতের চোখ লোভে চকচক করতে থাকে। তাই তাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে কাজ গোছাতে চায় চৌপটলাল। এটা তার এক নিপুণ রণকৌশল।

রামচরিত বলেন, 'কিন্তু আমি যা বলেছি তার নড়চড় হবে না। তোমাদের পাড়াটা তুলে দিতেই হবে।'

'সরকার, মা-বাপ, এতগুলো আওরতের কথা ভালো ক'রে ভেবে দেখুন। কী হাল হবে তাদের—' বলতে বলতে রামচরিতের পায়ের কাছে প্রায় ভেঙে পড়ে রতিয়া।

ঘরটা এতই ছোট মাপের যে পেছনে সরার জায়গা পাওয়া যায় না। পবিত্র চতুর্বেদী বংশের সম্মানিত প্রতিনিধি রামচরিতকে ছোঁয়ার ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই হয়ত ছিল না রতিয়ার। কিন্তু কীভাবে যেন তার হাত দুটো রামচরিতের পায়ের ওপর এসে পড়ে।

শুধু হাতই না, রামচরিত টের পান, তাঁর পা রতিয়ার বুকের ভেতর ঢুকে গেছে। কোমল অথচ দৃঢ়, উপচে-পড়া উথলে-ওঠা দুটি স্তনের চাপ অনুভব করতে করতে রামচরিতের মাথা এবং মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। কান গরম হয়ে ওঠে। নাকের ভেতর দিয়ে তপ্ত লু-বাতাস বেরুতে থাকে।

মধ্যবয়সের শেষ সীমায় পৌঁছে রামচরিতের শান্ত স্তিমিত নিয়মানুবর্তী জীবনযাত্রায় হঠাৎ দু ধরনের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে—চুনাও এবং রতিয়ার মারাত্মক শরীর। এতদিন চুনাওর উত্তেজনা তাঁকে মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব কিছু প্রবল শক্তিতে সরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় উত্তেজনাটা তাঁর ফেনায়িত রক্তস্রোতকে তোলপাড় ক'রে ফেলতে লাগল। রামচরিত টের পেলেন, পঞ্চান্ন বছরের শিথিল পেশিগুলোর তলায় বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে; স্নায়ুগুলো স্টিলের তারের মতো টান টান হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ চতুর্বেদী বংশের সুনাম, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ঘরে গোমতীর মতো সাধ্বী ধর্মপত্নী এবং তাঁর দীর্ঘকালের ব্রহ্মচর্য—সব ভুলে গিয়ে তিনি নীচু হয়ে রতিয়ার ওপর ঝুঁকে পড়েন।

আরো কিছুক্ষণ পর রামচরিত টের পান একটি কাম্য নারীদেহ তাঁর শরীরে মিশে যাচ্ছে। সুগোল স্তন, নাভিমূল, প্রগাঢ় মাংসল উরু, রেশমের মতো মসৃণ চামড়া, নরম উষ্ণ তলপেট—সব কিছু গলে গলে তাঁর সারা দেহে ঢুকে যেতে থাকে। তাঁর জিভ আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মতো একটা মুখের ভেতর অসহ্য উত্তাপে ঝলসাতে থাকে। তাঁর গলার মধ্য থেকে শীৎকার উঠে আসে। অসহ্য সুখে এবং তৃপ্তিতে সেটা শিসের মতো রি রি ক'রে কাঁপতে থাকে।

একসময় দু'জনেই উঠে বসেন। কালিপড়া লণ্ঠনের ঝাপসা আলোয় রতিয়াকে অপার্থিব দেখাতে থাকে।

মুখ নামিয়ে এলোমেলো শাড়ি চাদর এবং চুল ঠিক করতে করতে রতিয়া ফিসফিস ক'রে বলে, 'আজ হামানিকো বহোত 'পুণ'কা দিন ; হুজৌরকা কিরপা মিলা—' একটু থেমে আবার বলে, 'লেকেন আমাদের টুলির কী হবে সরকার ?'

রামচরিত বলেন, 'কাল রাতে চৌপটলালকে পাঠিয়ে দিও। তোমাদের যাতে ক্ষতি না হয়, দেখব।'

রতিয়ার দু'চোখে পলকের জন্য বিজলি খেলে যায়। যে কারণে এই মধ্যরাতে আসা রামচরিতের কাছ থেকে সেটা একরকম ছিনিয়েই নিয়েছে সে। রতিয়া জোরে শ্বাস টেনে জানায়, 'পাঠাব বড়ে সরকার।' বলে, কি ভেবে ফের শুরু করে রতিয়া, চাপা নীচু গলায় শুধোয়, 'আমি কি বড়ে সরকারের কিরপা আর পাব ?'

রামচরিত বলেন, 'চৌপটলালকে জানিয়ে দেব।'

রতিয়া চলে যাবার পর বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রামচরিতের মনে হয়, তাঁর সারা গায়ে আওরতটার উষ্ণ শরীরের গন্ধ এখনও মিশে আছে। গিধের পাল অনেক আগেই রতিয়ার দেহ উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়েছে। তবু ঘৃণা হয় না রামচরিতের। কোনোরকম অপরাধ বা পাপবোধও তাঁর মধ্যে কাজ করে না। রেণ্ডিটুলির একটা সামান্য আওরত তাঁর হাতে জীবনের সব থেকে সেরা, বাঞ্ছিত সুখটি তুলে দিয়েছে।

পরিতৃপ্ত সুখী আচ্ছন্ন রামচরিত যখন দোতলায় নিজের ঘরে পৌঁছন, তখনও গোমতীর নাক ডাকছে। এক পলক দূরের খাটটার দিকে তাকিয়ে, অন্ধকারে মশারির ভেতর একটা বিশাল শরীরের কাঠামো লক্ষ্য করেন। তারপর নিজের খাটে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে ডান ধারের দেয়ালের দিকে এগিয়ে যান। ওটার কলুঙ্গিতে নানা মাপের শিশি এবং বোতলে গঙ্গাজল রয়েছে। স্ত্রীর

খাটের দিকে ফের তাকিয়ে একটা শিশি খুলে মাথার গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন। রক্তের ভেতর বহুদিনের সংস্কার যেভাবে শিকড় ছড়িয়ে আছে তার হাত থেকে মুক্তি নেই।

পরদিন মাঝরাতে রামচরিত চৌপটলালকে জানিয়ে দেন, এখান থেকে সাত মাইলে দূরে যে বিরাট স্টিলের কারখানা বসছে তার গায়ে তাঁদের পাঁচ বিঘের মতো জমি আছে। আপাতত রেণ্ডিটুলিটা সেখানে তুলে নিয়ে যেতে হবে। জমিটা যে তিনি দিচ্ছেন এ কথা কাউকে জানানো চলবে না।

আসলে ঐ জায়গাটা চৌবেদের হলেও গোমতীর বাপের বাড়ির এক নৌকরের নামে বেনামা করা আছে।

চৌপটলাল ঘরের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে মাথা ঠেকিয়ে বলে, 'সরকারকা বহোত কিরপা।'

রামচরিত বলেন, 'আমার ভোটের ব্যাপারটা মনে আছে তো?'

'বেশখ সরকার।'

রামচরিত রেণ্ডিটুলির জন্য এই জমিদানের ব্যাপারে নিজের বিবেককে পরিষ্কার ক'রে নেন। ভাবেন, পৃথিবীতে রামসীতা মন্দির যেমন থাকবে, বেশ্যাপাড়াও তেমনি থাকবে। আবহমান এই নিয়ম চালু রয়েছে। নইলে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব। দীর্ঘকালের এই প্রথা তিনি ভাঙেন কি ক'রে?

রামচরিত জগৎনারায়ণদের বলেছিলেন, কোন কৌশলে রেণ্ডিটুলির চারশো পনেরটা সলিড ভোট আদায় করবেন—পরে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু বেশ্যাপাড়ার জন্য ভূদানের খবরটা শেষ পর্যন্ত আর দেন না।

এখন জগৎনারায়ণ বা বিষ্ণুকান্ত অথবা মনপসন্দ—সবাই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের আনুগত্যের তুলনা নেই। কিন্তু পরে তাঁদের সঙ্গে যদি সম্পর্কে চিড় ধরে? অন্যের হাতে, সে যত ঘনিষ্ঠই হোক, নিজের মারণাস্ত্র তুলে দিতে নেই।



পনের দিন পর পঞ্চাশ বছরের পুরনো রেণ্ডিটুলি লখিনপুরা থেকে শিকড় তুলে সাত মাইল দূরে চলে যায়। রামচরিতের জন্যই যে এই দুরূহ কাজটি সম্ভব হয়েছে সে খবর হাওয়ায় হাওয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে। এই একটি কারণে লখিনপুরার মানুষ আমৃত্যু তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

আরো তিন সপ্তাহ বাদে পৌষের মাঝামাঝি একদিন এখানে নির্বাচন হয়ে যায়।

আজ সকাল থেকে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে ভোট গোণা শুরু হবে। বিকেল নাগাদ রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে।

রেণ্ডিটুলি তুলে দেবার জন্য আপার কাস্ট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়াথদের বেশির ভাগ ভোটই যে রামচরিত পাবেন, এটা প্রায় অবধারিত। রেণ্ডিটুলির সলিড ভোটগুলোও তাঁর পক্ষেই পড়বে। তবু জেতার ব্যাপারে সংশয় এবং দুশ্চিন্তা পুরোপুরি কাটে নি।

ভোরে উঠেই স্নান সেরে রামচরিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে চলে যান রামসীতা মন্দিরে ; সেখান থেকে বাড়ি ফিরে কুলদেওতা শিউশঙ্করকে প্রণাম করেন। দুই মন্দিরেই মনে মনে মানত করেন, চুনাওতে জিততে পারলে বহুত ভারী পূজা চড়াবেন। রামসীতাকে সোনার মুকুট দেবেন, শিউশঙ্করকে দেবেন সোনা দিয়ে গাঁথা রুদ্রাক্ষের হার।

দু জায়গায় প্রণাম করার পর পাখিদের দানা খাইয়ে ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবির ওপর দামী কাশ্মিরি শাল জড়িয়ে একতলার বসবার ঘরে চলে আসেন। এর মধ্যেই মনপসন্দ যদুনন্দন বিষ্ণুকান্ত এবং চন্দ্রেশ্বর এসে গেছেন। তবে বেশির ভাগ চুনাও-কর্মী নিয়ে বিষ্ণুকান্ত এবং জগৎনারায়ণ মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে চলে গেছেন। ভোট গোণার সময় তাঁরা রামচরিতের পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে ওখানেই থাকবেন। একটা জিপও ওঁদের সঙ্গে গেছে। রামচরিত এবং ধরতীলাল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কে কত ভোট পাচ্ছে, কে কার থেকে কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে আছে, আধ ঘণ্টা পরপর দু'জন চুনাও-কর্মী ঐ জিপটায় ক'রে এসে খবর দিয়ে যাবে।

রামচরিত জিতে যাবেন, এটা ধরে নিয়েই আগে থেকে বিপুল আয়োজনও করা হয়েছে। দশ বারোটা জিপ, ফীটন এবং অগুণতি সাইকেল সামনের ফাঁকা জায়গাটায় মজুত করেছেন জগৎনারায়ণরা। ওগুলো দিয়ে বিজয় মিছিল বার করা হবে। তা ছাড়া রসুইকরদের দিয়ে কাল রাতে বানানো হয়েছে ঝোড়া ঝোড়া উৎকৃষ্ট ভয়সা ঘিয়ে তৈরি লাড্ডু, বিরাট বিরাট টিন ভর্তি গুলাব জামুন এবং বুন্দিয়া। জেতার খবরটা আসা মাত্র এই সব 'মিঠাইয়া' লখিনপুরার মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

প্রচুর ফুল এবং মালারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলো যাতে রেজাল্ট ঘোষণার সময় পর্যন্ত টাটকা থাকে, সেজন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছে নৌকররা। তা ছাড়া অভ্রের কুচি মেশানো লাল সবুজ এবং ম্যাজেণ্টা রঙের সুগন্ধি আবীর কেনা হয়েছে এক কুইণ্টাল। রাস্তায় রাস্তায় বিজয় মিছিল যখন ঘুরতে থাকবে তখন চারপাশের লোকজনকে ওগুলো মাখানো হবে। অজস্র আতসবাজিও কেনা হয়েছে। সন্ধেবেলা আন্ধেরা নামার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো ফাটানো হবে। আলোর ঝলসে ভরে যাবে শীতের আকাশ। পৌষ মাসে লখিনপুরা টাউনকে একটি নতুন দেওয়ালীর রাত উপহার দেবেন রামচরিত।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ভোট গোণা শুরু হয়। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে সাড়ে দশটা থেকে দুই চুনাও-কর্মী সেই জিপটা নিয়ে অনবরত রামচরিতের বাড়ি আর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ছোটাছুটি করতে থাকে।

এক একটা টুলি বা পাড়া ধরে ভোট গোণা চলছে। যেসব টুলিতে আপার কাস্ট অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বামহন-কায়াথরা থাকে সেই জায়গাগুলোর বেশির ভাগ ভোটই পাচ্ছেন রামচরিত। এটা আগে থেকেই আঁচ করা গিয়েছিল। তবে এসব জায়গার কিছু কিছু ভোট ধরতীলালও পেয়েছে। আপার কাস্টের কিছু ভোটারের এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পরে এ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে আসল হেতুটা।

আপার কাস্টের ভোটে ধরতীলাল ভাগ বসালেও অচ্ছুৎ এবং মাইনোরিটি ভোট একটাও পান নি রামচরিত। একাত্মতা এবং সলিডারিটি কাকে বলে সেটা ওরা টের পাইয়ে দিতে থাকে।

কখনও রামচরিত কিছু ভোটে এগিয়ে যান ; কখনও ধরতীলাল এগোয়। এইভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এক দুর্ধর্ষ শ্বাসরোধী লড়াই চলতে থাকে। ভোটদাতাদের যা মতিগতি দেখা যাচ্ছে তাতে কে জিতবে কে হারবে, নিশ্চিতভাবে আগে থেকে বলা অসম্ভব।

বিকেল চারটে পর্যন্ত প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং টেনসানের মধ্যে কাটে। তারপর চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্যন্ত রামচরিত পাঁচশো তের ভোটে জিতে গেছেন।

পাড়া অনুযায়ী মতদানের যে হিসেব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় রেণ্ডিটুলির পুরো চারশো পনেরটা ভোটই পেয়েছেন রামচরিত। ওরা যা কথা দিয়েছিল তার এতটুকু নড়চড় হয় নি। বেশ্যাদের এই সলিড ভোটগুলো না পেলে রামচরিতের পক্ষে কিছুতেই চুনাওতে জেতা সম্ভব হতো না।

রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে জগৎনারায়ণ এবং রাজগৃহ মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে রামচরিতের বাড়ি চলে এসেছেন। তার পরেই শুরু হয়ে যায় তৌহার।

রামচরিতকে যুঁই গোলাপ এবং রজনীগন্ধার অগুণতি মালা প রানো হয়। মাথা মুখ আর জামাকাপড়ে মাখানো হয় প্রচুর সুগন্ধি ফাগ।

একা রামচরিতই নন, জগৎনারায়ণ রাজগৃহ থেকে শুরু ক'রে একজন চুনাও-কর্মীও বাদ যায় না। সবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আবীরে মাখামাখি হয়ে যায়।

এবার বেরোয় বিজয় মিছিল। একটা খোলা জিপে রামচরিতকে তোলা হয়। সেটাতে মনপসন্দ জগৎনারায়ণ বিষ্ণুকান্ত এবং চন্দ্রেশ্বরও ওঠেন। জগৎনারায়ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী রামচরিত গাড়ির মাঝখানে হাতজোড় ক'রে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। নির্বাচনে জেতার পর জননেতাদের এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোটদাতাদের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানানো নাকি এখনকার রাজনৈতিক প্রথা।

রামচরিতদের জিপটা আগে আগে চলে। সেটার পেছনে অন্য সব জিপ, ফীটন এবং সাইকেল। পেছনের গাড়িগুলোতে রয়েছে চুনাও-কর্মী এবং রামচরিতের সমর্থকরা। তাদের মুহুর্মুহু চিৎকারে লখিনপুরার আকাশ চৌচির হয়ে যেতে থাকে।

'রামচরিত চৌবে—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'এম্লে বনা কৌন ?'

'রামচরিত চৌবে।'

'মন্ত্রী বনেগা কৌন ?'

'রামচরিত চৌবে।'

রাস্তার দু'ধারে এখন প্রচুর লোক। গোটা লখিনপুরা বিজয় মিছিল দেখতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

একদল চুনাও-কর্মী রামচরিতের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগোয়। আরেক দল আকাশের দিকে মুঠো মুঠো ফাগ ওড়াতে থাকে। কাছাকাছি যাদের পায় তাদের মাখিয়েও দেয়।

যেখান দিয়ে মিছিলটা যাচ্ছে সেখানকার সিকি মাইল উঁচু পর্যন্ত বায়ুস্তর আবীরে রঙিন হয়ে থাকে। আবীরের সুগন্ধে চারদিক ম ম করে।

অন্য একটা দল দু'ধারের লোকজনকে লাড্ডুয়া এবং গুলাবজামুন বিলোতে থাকে। তার ফলে সাঙ্ঘাতিক হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়।

চুনাও-কর্মীদের আরেকটা দল দিনের পর্যাপ্ত আলো থাকতে থাকতেই বাজি ফাটাতে থাকে। আন্ধেরা নামার আগেই দীপাবলী শুরু হয়ে যায়।

রামচরিতের জিপ খুব আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। হুস ক'রে বেরিয়ে যাওয়াটা কাজের কথা নয়। নির্বাচনে জেতার পর সবাইকে সুচারুভাবে দর্শন দেওয়াটা রেওয়াজ।

চারদিকে এত মানুষ, এত জয়ধ্বনি, এত স্লোগান! সবকিছু দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে, ভেতরে ভেতরে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আর সুখকর উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন রামচরিত। তবু তারই মধ্যে টের পান কোথায় যেন একটা ছোট্ট খিঁচও থেকে গেছে।

ডানপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন জগৎনারায়ণ। গলার স্বর অনেক নামিয়ে ফিসফিসিয়ে রামচরিত তাঁকে বলেন, 'জিতলাম ঠিকই, তবে বেশ্যাদের ভোটে। আনন্দটা পুরোপুরি হচ্ছে না।'

জগৎনারায়ণ বলেন 'ও নিয়ে ভাববেন না। কারা ভোট দিয়ে জিতিয়েছে সেটা আদৌ বড় ব্যাপার নয়। আসল কথাটা হল, আপনার জেতার ফলে হিন্দু ধরম বেঁচে যাবে।'

তবু কিছুক্ষণ খুঁত খুঁত করতে থাকেন রামচরিত।

অনেকগুলো রাস্তা ঘুরে মিছিলটা একসময় লখিনপুরা টাউনের মাঝখানে চলে আসে। আর তখনই ডান দিকে ভিড়ের ভেতর

ফলুটবালা ঠাণ্ডিলালকে দেখতে পান রামচরিত। সঙ্গে সঙ্গে জামার ভেতর অদৃশ্য পোকা হাঁটার মতো অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

রেণ্ডিটুলিতে যেদিন জনসংযোগ করতে যান, ঐ ভূচ্চারের ছোঁয়াটাকে শেষ দেখেছিলেন। তারপর এত সব উত্তেজক ব্যাপার ঘটে গেছে যে তার কথা মনেই ছিল না। তা ছাড়া মাঝখানে বেশ কিছুদিন তাকে রাস্তাঘাটে দেখাও যায় নি।

রামচরিতের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে যায়। এখন আর কোনো দিকে লক্ষ্য নেই তাঁর; পলকহীন ঠাণ্ডিলালের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এত লোকজনের সামনে গিধের বাচ্চাটা কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, কে জানে।

ঠাণ্ডিলালও রামচরিতের দিকে তাকিয়ে ছিল। আচমকা দু' হাতে ভিড় ঠেলে জিপের কাছে চলে আসে। তারপর নাকের ভেতর একটা অদ্ভুত সুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোমর বাঁকিয়ে গাইতে থাকে:

'রামচরিত চৌবে এম্লে বনা—
আ গিয়া রামরাজ।
রেণ্ডিটুলিকা ভোটমে জিতা—
আ গিয়ে রামরাজ।'

গাওয়া শেষ হলে হাততালি দিতে দিতে চারপাশের লোকজনের উদ্দেশে বলে, 'আরে ভেইয়া, তালিয়া বাজাও, তালিয়া বাজাও—'

গোটা রাস্তাটায় মুহূর্তে স্তব্ধতা নেমে আসে। চারদিকের লোকজন কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শব্দ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলতেও তাদের ভয় হয়।

এদিকে ধীরেসুস্থে প্যান্টের ছেঁড়া পকেট থেকে তার সেই বিখ্যাত 'ফলুট' বার করে ঠাণ্ডিলাল। তারপর মুখটা সামান্য উঁচুতে তুলে প্যাঁ প্যাঁ ক'রে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সেটা একটানা বাজাতে থাকে। ফলুটের সুর থেকে বিদ্রূপ আর ঘৃণা বেরিয়ে উত্তুরে হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়।

রামচরিত চমকে ওঠেন। এতকাল সুদখোর কর্পূরী দুবে,

ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার নাথমল চৌরাসিয়া আর লম্পট রণধীর সিংয়ের পেছনেই এভাবে ফ্লুট বাজিয়েছে ঠাণ্ডিলাল। এই প্রথম তাঁর বিরুদ্ধে বাজাল। অর্থাৎ নাথমলদের স্তরেই সে তাঁকে নামিয়ে এনেছে।

জিপে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাজগৃহ তেওয়ারি। বিদ্যুৎগতিতে তাঁর দিকে ফিরে তীব্র গলায় রামচরিত বলেন, 'ঐ হারামজাদের বাচ্চাটার ব্যবস্থা না করতে বলেছিলাম আপনাকে? কুত্তাটা এভাবে আমাকে বেইজ্জৎ করছে।'

রাজগৃহ ভয় পেয়ে যান। কাচুমাচু মুখে বলেন, 'ভেবেছিলাম, চুনাওটা চুকে গেলেই একটা কিছু করব।' পরক্ষণেই চুনাও-কর্মীদের উদ্দেশে চিৎকার ক'রে ওঠেন, 'পাকড়ো, পাকড়ো গিদ্ধড় জানবারকো—'

তক্ষুণি নির্বাচন-কর্মীরা ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে পড়ে। আজ আর পালাতে পারে না ঠাণ্ডিলাল। ধরা পড়ে যায় এবং বেদম মার খেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে।

রাজগৃহ পরিতৃপ্ত মুখে একবার রক্তাক্ত বেহুঁশ ঠাণ্ডিলালকে দেখেন। তারপর রামচরিতকে বলেন, 'চিন্তা করবেন না চৌবেজি। আজ গিদ্ধড়টাকে কোথাও আটকে রাখা হবে; হুঁশ ফিরলেই কাঁকের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেব।'

মিছিলটা কয়েক মিনিট থমকে থাকার পর আবার মসৃণ গতিতে এগিয়ে যায়।

রামচরিতের অস্বস্তিটা পুরোপুরি কেটে গেছে। পেছনে 'ফ্লুট' বাজিয়ে ঝামেলা করার মতো আর কেউ থাকবে না লখিনপুরায়। এ ব্যাপারে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত।

রেণ্ডিটুলির ভোটে নির্বাচিত রামচরিত্র চতুর্বেদী এখন শুদ্ধ মনে মহান হিন্দুধর্মকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে বাঁচাবার কাজ শুরু করতে পারবেন।
